যোদ্ধা-সাহিত্যিক
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জন্ম শতবর্ষ স্মরণে

সম্পাদকীয়

গোগোলের ওভারকোট থেকে যেমন রাশিয়ার বস্তুবাদী সাহিত্যের জন্ম তেমনি 'মহেশ' গল্প মারফত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই এদেশে এই ধারার প্রবর্তক। 'মহেশ' গল্পে চাষিশ্রেণীর প্রতিনিধি গফুর সর্বপ্রথম সাহিত্যে তার শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি-সহ উপস্থিত। গ্রাম্য অর্থনীতি থেকে উৎখাত চাষির চটকলের মজুরের পরিণতির ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকে শরৎচন্দ্র লক্ষ্যবিদ্ধ করেছেন। এই গল্পে লেখক মার্কসবাদী চেতনার বীজকেই উপ্ত করে গেছেন। মন্দভাগ্য আমাদের লেখকের এই ভূমিকাকে এখনো পর্যন্ত আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। মনে রাখতে হবে 'মহেশ' 'অভাগীর স্বর্গ' 'পথের দাবী'র মতো সচেতন রচনাগুলি একদা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৯২২-২৩-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলি নিঃসন্দেহে পত্রিকাটির সচেতন ভূমিকার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেননি। কিন্তু তাঁরই উত্তরসূরী লেখকগণ তাঁদের চোখের সামনেই এই দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূচনা থেকে অন্ত পর্যন্ত দেখেছেন। দেখেছেন তারি পায়ে পায়ে দুর্ভিক্ষ, দাংগা, দেশবিভাগ এবং পরিশেষে ক্ষমতা হস্তান্তর।

রাষ্ট্রজীবনে এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের পাকা দলিল পেতে হলে মার্কসবাদী লেখকদের রচনারই সাহায্য নিতে হবে। মার্কসবাদে দীক্ষিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী পরশুরামের কুঠারের মত ঝলসে উঠল। ব্যঙ্গে, কঠোরতায় নিষ্ঠুর দৃষ্টি। কোনো আপস নয়, কোনো ক্ষমা নয়। অজস্র ছোটগল্পে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-জনিত পরিস্থিতিকে মানিকবাবু অননুকরণীয় শিল্পী-দৃষ্টিতে উলঙ্গ করে দেখালেন। এই গল্পগুলি সচেতন পাঠকের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে রেখেছে।

শুধু মানিকবাবু কেন, যদিচ মেজাজ রোমাণ্টিক আদর্শবাদে ভরপুর তথাপি কাব্যিক ভাষায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক, নবেন্দু ঘোষ—একই বাতাবরণকে উজ্জ্বল করে তুললেন।

এঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র সেনই বোধকরি বিষয় নির্বাচনে এবং বর্ণনায় মানিকবাবুর মতোই নিষ্ঠুর, ক্ষমাহীন।

লেখকদের মার্কসবাদের শিক্ষা জনতার নিকটে পৌঁছবার স্পৃহাকে উদ্দীপিত করেছে। শুধু যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাংগা-জর্জর মানুষের নঙর্থক কাহিনীই নয়, সদর্থে সক্রিয় সচেতন মানুষের বৃহত্তর জীবনের আশা আকাংক্ষা ফূর্ত হয়ে উঠল দেশজোড়া তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে। কৃষিপ্রধান সমাজব্যবস্থায় চাষিদের লড়াই একটা প্রধান ঐতিহাসিক সত্য। মার্কসবাদী আন্দোলনে তেভাগার পশ্চাদপটে রচিত ছোটগল্পগুলি একেকটি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড। এই পর্বে ছোট বড় মাঝারি লেখকদের ফসল অফুরন্ত।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী,' 'হারানের নাতজামাই'-শীর্ষক মানিকবাবুর গল্পগুলি অনবদ্য। এই গল্পগুলি বহুপঠিত বলেই এই সংকলনে জীবনযুদ্ধে বলিষ্ঠ চেতনার অধিকারী প্রতিরোধে সক্ষম দুই বিধবার অসমসাহসিক চরিত্র 'মাসিপিসি'-কে আমরা বেছে নিয়েছি। অথচ বাতাবরণ একটুও নষ্ট হয়নি।

রমেশচন্দ্র সেনের 'এক ফালি জমিতে' এদেশের ভিখারি শ্রেণীর সর্বহারা মানবতাবাদকে তুলে ধরা হয়েছে। যাদেরকে লুমপেন প্রলেটারিয়েত বলা হয়ে থাকে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কমপঠিত 'তীর্থযাত্রা' গল্পে লেখকের রোমান্টিক আদর্শবাদিতা সপ্রমাণ।

নরেন্দ্র ঘোষের 'কান্না' আবহমান দরিদ্র চাষি রমণীর জমি-হারানোর মর্মন্তুদ চিত্র। আজো পর্যন্ত কী এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে? বিষয়লীন হতে পারার জন্যে লেখকের রোমান্টিক স্বভাব তেমন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি।

সুশীল জানার 'সখা' গ্রামের চাষি আন্দোলন-নির্ভর তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির অন্যতম। সমান বলিষ্ঠতায় আঁকা শহরের মজুর জীবনের গল্পগুলিও তাঁর অনবদ্য।

বহুপঠিত ননী ভৌমিকের 'ধানকানা' গল্পকে পরিহার করে আমরা চা বাগানের শ্রমিকজীবনের বিখ্যাত 'হটাবাহার' গল্পটি নির্বাচন করেছি।

সলিল চৌধুরীর খ্যাতি সুরকার হিসেবে হলেও তাঁর একদা-প্রকাশিত 'ড্রেসিং টেবিল' গল্পে দাংগার প্রসঙ্গে মানবিকতার সুর স্পষ্ট। পরবর্তীকালে খ্যাতিমান চিত্র-পরিচালক ঋত্বিককুমার ঘটকের 'সড়ক' গল্পটির সুরও তেমনি মানবিক। রাজনৈতিক বিদ্বেষে নিহত সোমেন চন্দের 'দাংগা' গল্পটি তাঁর

উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির অন্যতম। সুলেখা সান্যালের গল্পে গৃহস্থ নারীর মোহমুক্তি ঘটেছে।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্যের ঝাঁঝালো তীব্রতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। 'অমিত্রাক্ষর' গল্পটি তাঁর মেজাজের বাইরে চমৎকার উৎরে গেছে। মিহির আচার্য তাঁর 'আজ কাল পরশু' গল্পে সচেতন পাহারার মধ্যে চিরন্তন বিপ্লবের রাজনৈতিক বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন।

এদেশে মার্কসবাদী আন্দোলন এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে। আশার কথা সৃজনশীল মার্কসীয় দার্শনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ লেখকেরা সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে এই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

এই সংকলন পূর্বপ্রকাশিত 'পশ্চিম বাঙলার গল্পসংগ্রহের'-ই পরিপূরক গ্রন্থ। আরো একটু বিশদ করার প্রয়াস। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কারণেই লেখক নির্বাচনকে সংকুচিত করতে হয়েছে। সে জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

মিহির আচার্য

সূচীপত্র

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।

জমিদারের ছোট ছেলের জন্মতিথি-পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বালিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে—যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ী। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে, এবং অন্তঃপুরের লজ্জা-সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ও গফ্‌রা, বলি, ঘরে আছিস ?

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে ? বাবার যে জ্বর !

জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া একটা পুরাতন বাব্‌লা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্ছে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁঝে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত

খরবাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফের্‌বার পথে দেখচি তেমনি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হ'লে যে কত্তা তোকে জ্যান্তে কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়!

কি কর্‌ব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে প'ড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধ'রে যে দুখুঁটো খাইয়ে আন্‌ব—তা মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপ্‌নি চরাই ক'রে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয় নি—খামারে প'ড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয় নি, মাঠে আলগুলো সব জ্ব'লে গেল—কোথাও একমুঠো ঘাস নেই, কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবাঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্‌ তো ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু আঁটি বিচুলি ফেলে দে না, ততক্ষণ চিবোক্‌। তোর মেয়ে ভাত র াঁধে নি? ফ্যানে-জলে দে না এক গাম্‌লা, খাক্‌।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি করলি খড়? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গোরুটার জন্যে এক আঁটি ফেলে রাখ্‌তে নেই? ব্যাটা কসাই।

এক নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবারে ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া ব'লে কত্তামশায় সব ধ'রে রাখ্‌লেন। কেঁদে কেটে হাতে পায়ে প'ড়ে বল্‌লাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলি না হয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজাগাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ ম'রে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস! সাধ ক'রে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচি নে!

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল,—কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস-দুয়েক খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হ'য়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না, কহিলেন, আচ্ছা মানুষ তো তুই—খেয়ে রেখেছিস, দিবি নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা রাম রাজত্বে বাস করিস্—ছোটলোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে ক'রে মরিস্!

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে করব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করিনে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল তো? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভ'রে খেতে পর্যন্ত পাই নে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ বিষ্টি-বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে কোণে ব'সে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজ্‌রা গোনা যাচ্ছে—দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন-দুই ধার, গোরুটাকে দুদিন পেট পুরে খেতে দিই। বলিতে বলিতেই সে ধপ্‌ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু-পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মর্—ছুঁয়ে ফেল্‌বি না কি?

না বাবাঠাকুর, ছোঁব না, ছোঁব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন-দুই খড়। তোমার চার-চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেছি—এ ক'টি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবোলা জীব—কথা বল্‌তে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিল, ধার নিবি, শুধ্‌বি কি ক'রে শুনি?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন ক'রে পারি শুধ্‌বো বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুল কণ্ঠের অনুসরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না! যেমন ক'রে পারি শুধ্‌বো!...যা যা সর্, পথ ছাড়্‌। ঘরে যাই, বেলা হ'য়ে গেল! এই বলিয়া তিনি একটু মুচ্‌কিয়া

হাসিয়া পা বাড়াইয়া সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আ মর্, শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি ?

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েচে, এক মুঠো খেতে চায়—

খেতে চায় ? তা বটে ! যেমন চাষা তার তেম্‌নি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই ! নে-নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ্। যে শিঙ, কোন্ দিন দেখ্‌চি কাকে খুন কর্‌বে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, কহিল, তোকে দিলে না এক মুঠো ? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না— না দিক্ গে—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন ক'রে বুড়ো হয়েছিস্. তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নে—কিন্তু তুই তো জানিস্ তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গোরুটার পিঠের উপর রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেম্‌নি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশানের ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি ক'রে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন ক'রে বাঁচিয়ে রাখি বল্ ? ছেড়ে দিলে তুই গাদা ফেড়ে খাবি, লোকের কলাগাছে মুখ দিবি—তোকে নিয়ে আমি কি করি ! গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌তে—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দুচোখ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিক ওদিক চাহিল, তার পরে ভাঙা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের

কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শিগ্‌গির ক'রে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হ'লে আবার—

বাবা!

কেন মা?

ভাত খাবে এসো, বলিয়া আমিনা ঘর থেকে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েচ বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরোনো পচা খড় মা, আপনিই ঝ'রে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতরে থেকে শুনতে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার কর্‌চ?

না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেওয়ালটা যে প'ড়ে যাবে বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গিয়াছে এবং এমন করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না, এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশি জানে? অথচ এ উপায়েই বা কটা দিন চলে?

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েছি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে ত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই ম'রে গেছে।

নেই? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা—জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বল্‌লে বড় ক্ষিধে পেয়েচে?

তখন? তখন হয় ত জ্বর ছিল না মা।

তা হ'লে তুলে রেখে দি, সাঁঝের-বেলা খেয়ো।

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে, আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে ?

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল, কহিল, এক কাজ কর্ না মা, মহেশকে না হয় ধ'রে দিয়ে আয়। তখন রাতের-বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা ? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

২

পাঁচ-সাত দিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিত মুখে দাওয়ায় বসিয়া ছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই আমিনা সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেচ বাবা, মাণিক ঘোষেরা আমাদের মহেশকে থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূর পাগ্‌লি !

হাঁ বাবা, সত্যি ! তাদের চাকর বল্‌লে তোর বাপকে বল গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে ?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেচে, বাবা !

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহু-প্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু এ আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ, তেমনি গরীব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার নাই। বিশেষতঃ মাণিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে প'ড়ে এল বাবা. মহেশকে আন্‌তে যাবে না ?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বল্‌লে তিন দিন হলেই পুলিশের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌বে ?

গফুর কহিল, ফেলুক গে।

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কি, আমিনা তাহা জানিত না। কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখমাত্রেই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত, ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো একটা টাকা দিতে হবে, এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটা বসিবার মাচার নীচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর-দুয়েকের মধ্যে সে বার-পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাব্‌লাতলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি! একজন বুড়াগোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড়ো করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙব না, এর পুরোপুরিই দিলাম—নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা গোরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বল্‌চি—খবরদার বল্‌চি ভাল হবে না।

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন ?

গফুর তেম্‌নি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি! আমার জিনিস আমি বেচ্‌ব না—আমার খুসি। বলিয়া সে নোটখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আস্‌তে বায়না নিয়ে এলে যে ?

এই নাও না তোমাদের বায়না ফিরিয়ে। বলিয়া সে ট্যাঁক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দুটাকা বেশি নেবে, এই ত? দাও হে, পানি খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশি কেউ একটা আধ্‌লা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়া বিরক্ত হইল, কহিল, না ত কি? চামড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কি?

তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ বিশ্রী একটা কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, একথা কর্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র-অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়া ছিল। শিববাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা, তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাই নে। কোথায় বাস ক'রে আছিস, জানিস?

গফুর হাত জোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাই নে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন, আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদী এবং বদমেজাজী বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনও কর্‌ব না কর্তা। বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত নাকখৎ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবুবাবু সদয়কণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা, যা যা, হয়েচে। আর কখনো এ সব মতি-বুদ্ধি করিস নে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্তার পুণ্যপ্রভাবে ও শাসনভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং যে জন্য এই ধর্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্ন চিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তার গায়ে মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

৩

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ, কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্যন্ত নাই। কখনো এ-রূপের লেশমাত্র পরিবর্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, একথা আজ ভাবিতেই পারা যায় না। মনে হয় সমস্ত প্রজ্বলিত নভঃস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহঃ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই—সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।

এম্‌নি দিনে দ্বিপ্রহর-বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জন-মজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয় এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্বল তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায়, পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল—আমিনা, ভাত হয়েছে রে?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত ? কি বল্‌লি, হয় নি ? কেন শুনি ?

চাল নেই বাবা।

চাল নেই ? সকালে আমাকে বলিস্ নি কে ' ?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম !

গফূর মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে যে বলেছিলুম ! রাত্তিরে বল্‌লে কারু মনে থাকে ? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাকবে কি ক'রে ? রোগা বাপ্ খাক্ আর না খাক্, বুড়োমেয়ে চারবার পাঁচবার ক'রে ভাত গিল্‌বি ! এবার থেকে আমি কুলুপ বন্ধ ক'রে বাইরে যাবো ! দে, এক ঘটি জল দে, তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল্, তাও নেই।

আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্যন্ত নাই, তখন সে আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস্ করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস্ কি ? এত লোক মরে, তুই মরিস্ নে !

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল তাহার এই স্নেহশীল কর্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো অবধি তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোনদিন একবেলা, কোনদিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি মিথ্যা এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কীর পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়।

বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেঁসিতে পারে না ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়ত আজ জল ছিল না, কিংবা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ তাহার মেয়েকে কৃপা করিবার অবসর পায় নাই—এমনিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়েই জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা, ঘরে আছিস্‌ ?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন ?

এত বড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম, জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারানীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে অত ক্ষীণ কণ্ঠ অত বড় কানে গিয়া পৌঁছায় না—না হইলে তাহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুই-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পরে কি ঘটিল বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোটমেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয়—ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরীব বলিয়াই তাহাকে মাপ করা হইয়াছে। পূর্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে, হয়ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া, কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এতবড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে

সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল।

এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁস ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার বিক্ষিপ্ত ভাঙা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপরে সজোরে আঘাত করিল।

একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বাহিয়া ফোঁটা-কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার্‌পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটা তাহার যত দূরে যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে ম'রে গেল।

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষচক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তরের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে চক্‌চকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটা কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন; প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।

গফুর এ সকল কথার উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল্, আমরা যাই—

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কোথায় বাবা ?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

মেয়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজী হয় নাই—সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত আব্রু থাকে না, এ সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি করিস্ নে মা, চল্, অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল, ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুসি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি! যে তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাফ ক'রো না।

মাসিপিসি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাঁটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইঁটপাটকেল ও ওজনে ভারি আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটি-বাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দু'জন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সী, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাঁটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আরেকটা সালতি, দু'হাত চওড়া হয় কি না হয়। দু'মাথায় দাঁড়িয়ে দু'জন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দু'জনেরি কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ। গায়ে জামা আছে, নক্সা পাড়ের সস্তা শাদা শাড়ি। আঁটোসাঁটো থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

মাসিপিসি ফিরছে কৈলেশ, বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসিপিসির সালতি ক'হাতের মধ্যে এসে গেছে।

ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসিপিসি সালতির গতি ঠেকায়। আহ্লাদী সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটাটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, বেলা আর নেই কৈলেশ। পিছন থেকে পিসি বলে, অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ।

মাসিপিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খপরটা গোপন, দু'জনে লম্বা লম্বা সালতির দু'মাথায় থাকলে সম্ভব

নয় চুপে চুপে। মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদী যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে-সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি, কৈলাশ শুরু করে, মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড় সোমত্ত মেয়ে, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষ মানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো—

মাসি বলে, খুন্‌সুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দা কথাটা কি তাই কও, বললে না যে খপর আছে কি?

পিসি বলে, খপরটা কি তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।

মাসিপিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, জগুর সাথে দেখা হল কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এট্টু—মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।

মাসি বলে, চায়ের দোকান না কিসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কি?

পিসি বলে, শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে বারোমাস সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কি বললে জগু?

কৈলাশ ফাঁপড়ে পড়ে আড় চোখে চায় আহ্লাদীর দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসিপিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে, মাল খাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সে জগু নেই। বৌকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এলো তা মেয়ে দিলে না, তাতেই নিতে

আসে না আর। আমি বলি কি, নিজেরা যেচে একবার পাঠিয়ে দেও মেয়াকে।

মাসি বলে, পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে? কলকেপোড়া ছ্যাঁকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়ি বাঁধা হয়ে থাকতে দিন ভোর রাত ভোর?

পিসি বলে, লাথির চোটে ফের গভ্‌ভোপাত হতে? না মরতে?

গভ্‌ভোপাত? কৈলাশ বলে আশ্চর্য হয়ে, ফের গভ্‌ভোপাত? সত্যি নাকি মাসি? এ যে প্যাঁচালো ব্যাপার হল পিসি?

মাসি বলে, কিসের প্যাঁচালো ব্যাপার কৈলেশ? মুয়ে নুড়ো জ্বালব তোমার ফের যদি বলবে তুমি বেয়াক্কেলে কথা। জগু আসেনি ঘন ঘন ওকে নিতে? থাকেনি দু'দিন চারদিন করে?

পিসি বলে, মেয়ে না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই আদরে তাকে? ছাগলটা বেচে খাওয়াইনি দিয়ে ভালমন্দ দশটা জিনিস?

মাসি বলে, ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।

পিসি বলে, না কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা। ছল ছল চোখে এক একবার তাকায় আহ্লাদীর দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোট অবুঝ মেয়ে। তার ভালর জন্যই তাকে জোর জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল রহমান। আহ্লাদীর সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নেই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আহ্লাদীর ফ্যাকাসে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনি সে তাকায় আহ্লাদীর দিকে।

কৈলাশ বলে, তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বৌ নেয়ার জন্যে। তার বিয়ে করা বৌকে তোমারা আটকে রেখেছ বদ মতলবে, পয়সা কামাচ্ছ। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামী নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের।

আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজ কালের মধ্যে। মরবে তোমরা, জানো মাসি, জানো পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।

আহ্লাদী একটা শব্দ করে অস্ফুট আর্তনাদের মত। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কয়েকবার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলিল, জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামীর কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে ?

বলে' মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তর তর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাঁটার টানের বিপক্ষে। বেলা এক রকম নেই। ছায়া নামছে চারিদিকে।

শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আরেকটা গাছের দিকে, ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কি তার পাখা ঝাপটানি।

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদীর। দুর্ভিক্ষ কোনিমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারীর একটা রোগে, কলেরায়, সে, তার বৌ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসি পিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেকদিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছুটা তারা রোজকার করত—ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা জোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দু'জোড়া থান পরন—খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দু'জনের, রুপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে। আহ্লাদীর বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তার তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরমর মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিক সামলাবে? মাসিপিসির সেবাযত্নেই আহ্লাদী অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপমাও সেটা স্বীকার করেছে।

কিন্তু কি করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি বা সম্ভব অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে! পাল্লা দিয়ে মাসিপিসি আহ্লাদীর জীবনের জন্যে লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে, না পেল যদি তো না খেয়েই।

অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারিদিকে না খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি, একদিন মাসি বলে পিসিকে, একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতে তোরও দু'টো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।

শহরের বাজারে তরিতরকারী ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজী হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারো সাথে হয় তো মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকশব্জী ফলমূল নিয়ে মাসিপিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসিপিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখদুঃখের কথা তারা কাকেই বা বলবে কেই বা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেশারেশিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসি এ বাড়ির মেয়ে এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির ওপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হত এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হত তাদের দেখে। সে কি রাগ, সে কি তেজ, সে কি গোঁ! মনে হত এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বঁটি দিয়ে।

শাকশব্জী বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়া মাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উপে গিয়ে দু'জনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে

মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদীর ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের নিজের পেটভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দু'জনেরই এখন আহ্লাদী আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদীকে হয়তো শ্বশুরবাড়ি যেতে হত, মাসিপিসিও বিশেষ কিছু বলত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসিপিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়ে ছিল, আহ্লাদীকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদীকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনো মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়?

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহ্লাদীতে বর্তেছে, জগুর বউ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তাব সিকিমত আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদীকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দু'জনের মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদীকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, ডরাসৃনি আহ্লাদী। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয়তো কৈলেশকে দিয়ে ওসব কথা বলায় মোদের?

পিসি বলে, দু'দিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে কই না, আমি তো ওসব কিছু বলিনি কৈলেশকে!

মাসি বলে, চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা! মা মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।

পিসি বলে, ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহ্লাদী। তোর পিসে ছিল জগুর মত, মাল টানত আর মোকে মারত। খোকাটা কোলে আসতে কি হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপি চুপি এসে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বললে ওঠে বসতে বলিতো বসে, রাত দুপ্পুরে চুর হয়ে এসে হাতে পায়ে

ধরে বলে, একবারটি খোকাকে কোলে দে পদী—খোকা যেতে পাগলের মত দিবারাত্তির মাল খেয়ে খেয়ে নিজেও গেলো।

মাসি বলে, তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কি ছ্যাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদী, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ি ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।

পিসি বলে, তুইও যাবি, সোয়ামীর ঘর করবি। ডরাস্‌নি, ডর কিসের?

বাড়ি ফিরে দীপ জ্বেলে মাসিপিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদীর পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসিপিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মত লাগে। মাসিপিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কি ভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসিপিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারীর মত তাকেও কেনা যায় কিনা যাচাই করবার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কতরকমের দর দিয়েছে মাসিপিসির কাছে। মাসিপিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসিপিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসিপিসি, কি দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসিপিসিকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, শ্বশুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদী। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসিপিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদীকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সড়গড় হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দু'জনে মিলে কাজ যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে একথা বলতে হয়না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদীর কথা, আহ্লাদীর সুখদুঃখ, আহ্লাদীর সমস্যা, আহ্লাদীর ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে, চটবে জামাই, পুরুষ মানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত ওটা করা উচিত না, এসব
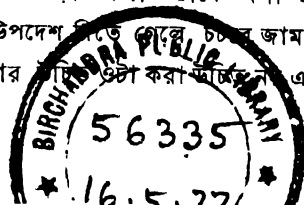
কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এইভাব দেখাবে মাসিপিসি—আহ্লাদীকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামী এসেছে বলে সেও যেন আহ্লাদে গদগদ হবার ভাব দেখায়। যে ক'দিন থাকে জামাই সে যেন অনুভব করে, সেই এখানকার কর্তা, সেই সর্বেসর্বা।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসিপিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিশ্বাস পড়ে দু'জনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকার বাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দু'জনের। এখন এল চৌকিদার কানাই। হাঙ্গামা না আসে রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই-চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসিপিসি বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দু'জনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাই-এর সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসিপিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।

মাসি বলে, এত রাতে?

পিসি বলে, মরণ নেই?

কানাই বলে, দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবে গো দিদিঠাকরুনরা! বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।

মাসিপিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন চারজন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসিপিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুণ্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটিবাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনেস্টবলের সঙ্গে। ওরা এসে আহ্লাদীকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?

পিসি বলে, আমি যাই চল?

কত্তা ডেকেছেন দু'জনকে।

মাসিপিসি দু'জনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।

পিসি বলে, সকড়ি হাত ধুয়ে আসি, এক দণ্ড লাগবে না।

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদা'র মত মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারি-বাড়ি যেতে নজ্জা করে। কাল সকালে যাবো।

পিসি বলে, এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই।

কানাই ফুঁসে ওঠে, না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালয় ভালয়, ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, বটে? ধরে বেঁধে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।

পিসি বলে, আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু'একটার।

দু'পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসিপিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যই তারা খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসিপিসির।

মাসি বলে, শোন কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েলোক পারব না জানি কিন্তু দুটো একটাকে মারব জখম করব ঠিক।

পিসি বলে, মোরা নয় মরব।

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসিপিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশেপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে হাঁক দেয়, ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষ মশায়! ও জনাদ্দন! ওগো কানুর মা, বিপিন, বংশী...

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হট্টগোলের পর আরও নিঝুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদীকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসিপিসির চোখে। বিপদে

পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসিপিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এত লোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হল সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসিপিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, জানো বেয়ান, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি ?

পিসি বলে, তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে ফেলায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।

খানিক চুপচাপ ভাবে দু'জনে।

মাসি বলে, সজাগ রইতে হবে রাতটা।

পিসি বলে, তাই ভাল। কাঁথা কম্বলটা চুবিয়ে রাখি জলে, কি জানি কি হয়।

আস্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদীর ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদীর বাপের আমলের গরুটা নেই, মাটির গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরানো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলসীতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরী হয়ে থাকে মাসিপিসি।

একফালি জমি

রমেশচন্দ্র সেন

বসিয়া ভিক্ষা করিবার উপযোগী এমন জায়গা আশেপাশে আর নাই। চারদিক হইতে চারিটি রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে। কলিকাতা শহর ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে এই দিকটায়।

পাশেই বাজার, একটু দূরে পশ্চিম দিকের রাস্তার শেষ প্রান্তে আদিগঙ্গা, গঙ্গার উপরে হিন্দুর পীঠস্থান কালীমন্দির।

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর জনমেজয় এইখানে বসিয়া ভিক্ষা করে, পরিষ্কার একটি সিগারেটের কৌটা তুলিয়া ধরিয়া পথিকদের উদ্দেশে বলে, খোঁড়া নাচারকে—

গঙ্গাস্নানান্তে দেবী-দর্শনের পর পুণ্যলোভাতুর মানুষের কোমল মন সেই কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারে না। জনমেজয়ের ভিক্ষার কৌটা ভরিয়া যায়।

আগে দিনই চলিত না। এইখানে বসার পর হইতে তার ভাগ্য ফিরিয়াছে, স্বচ্ছলতা দেখা দিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে মনের প্রসারতা।

সে ঘরভাড়া দেয় মাসে দু'টাকা, পোষ্য তার অনেকগুলি, দুটি বিড়াল, একটি কুকুর, তার চার পাঁচটি ছানা, এক খাঁচা মনিয়া, আরও নানারকমের পাখি।

তার এই সৌভাগ্য অন্যান্য ভিখারিদের সহ্য হয় না। কেহ বলে, লোকটার বরাত দেখেছ; যাকে বলে চাঁদা কপাল।

গণেশ বলে, বরাত শুধু ওর নয়, ঐ জায়গাটারও; একটু বৃষ্টির জলও কখন জমতে দেখলাম না, অথচ আমাদের বেলা আকাশে মেঘ ডাকতে না ডাকতেই পথঘাট ভেসে যায়; থাকো দুদিন উপোস করে।

নিজের উপবাসী থাকার যে কষ্ট তার চেয়ে গণেশ বেশি কষ্ট অনুভব করিত জনমেজয়ের এই সৌভাগ্যের জন্য। একই বৃত্তি, কাছাকাছিই তারা বসে। রোজ তার অন্ন জোটে না, অন্ন যদি বা জুটিল, বিড়ি অথবা গাঁজা

কেনার জন্য একটি পয়সাও অবশিষ্ট থাকে না, আর একজন দিব্যি পশু পাখি পোষে, কুকুরকে নাকি দইও খাওয়ায়।

জনমেজয়ের এই জায়গাটার প্রতি লোভ ছিল অনেকেরই, কিন্তু তার দৃঢ় সবল বাহুর মাংসপেশী দেখিয়া লোভটা তারা সম্বরণ করিত। কিন্তু গণেশ তাহা পারিত না।

সে যেখানে বসে সে জায়গাটার কোন জলুস নাই, একটি গলিও আসিয়া সেখানে বড় রাস্তার সঙ্গে মেশে নাই, কাছে একটা ভাল দোকানের পর্যন্ত অভাব।

ভিক্ষা পায় না বলিয়া সে দোষ দেয় ভগবানকে ; রাগ করে জনমেজয়ের উপর এবং যে-দিন চার-ছয়টা পয়সাও জোটে না, সে-দিন 'হারামজাদা মাটি' বলিয়া নিজের বসিবার জমিটার উপর পদাঘাত করিয়া জননী ধরিত্রীর ঋণ শোধ করে।

দিনের পর দিন তাহার লোভ দুর্দমনীয় হইয়া ওঠে। যে করিয়াই হউক, জনমেজয়কে বে-দখল করা চাই-ই, তাহাতে যদি খুনাখুনি হইয়া যায়, তাহা হইলেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না।

জনমেজয়কে ভয় করিতে পারে ঐ খোঁড়া ভরত, কানা মেধো, কুঠে অবিনাশ, কিন্তু সে নয়।

তার গাঁজার কলিকার বন্ধু মধু সাবধান করিয়া দেয়, বলে ও বড় কঠিন ঠাঁই।

গণেশ উত্তর করিল, ওকে ভয় করতে পারিস তোরা, কিন্তু আমি নয়। আমরা ডাকাতের বংশ, আমার ঠাকুর্দা গুরু সর্দারের নামে থানার দারোগা পর্যন্ত ভয় পেত, একবার সে দারোগার নৌকোই টেনে রেখে দিলে।

একদিন সকাল হইতে ভিক্ষা না পাওয়ায় গণেশ স্থির করিল, আজই এর একটা হেস্ত-নেস্ত করিবে। এ ভাবে আর চলে না।

জনমেজয়ের নিকট আসিয়া বলিল, কি রে খোঁড়া, কত রোজগার হ'ল আজ ?

জনমেজয়ের চোখ দুটা লাল হইয়া উঠিল। গণেশ আবার বলিল, কথা কইছিস না যে খোঁড়া ?

জনমেজয় একটু পা টানিয়া হাঁটিত, সে বলিত, ওটা বাতের জন্য। তাই কেহ তাকে খোঁড়া বলিলে সে নিজেকে সামলাইতে পারিত না। সে উত্তর করিল, খোঁড়া আমি নই, খোঁড়া তোর বাপ্।

আমার বাবা খোঁড়া! তবে রে—বলিয়া গণেশ তার দিকে আগাইয়া যাইতেই জনমেজয় নিজের মোটা লাঠি তার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

গণেশের সৌভাগ্য যে সে পিছাইয়া গিয়াছিল, ঐ লাঠিটা তার শরীরে যে কোন জায়গায় লাগিলে সেখানকার হাড় গুঁড়া হইয়া যাইত।

পথের উপর হইতে লাঠিটা তুলিয়া গণেশ ছুটিতে আরম্ভ করে, জনমেজয় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তার পিছনে ছুটিয়া চলে।

গণেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, কি রে, তুই নাকি খোঁড়া ন'স্? তারপর লাঠিখানা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া সেদিনের মত চলিয়া গেল।

জনমেজয় লাঠি কুড়াইয়া লইল। তার মন অত্যন্ত বিরূপ হইয়া গেল, মানুষ শুধু শুধু ঝগড়া করিতে আসে কেন? সে ত গণেশের কোন ক্ষতি করে নাই, অথচ লোকটা তাকে খামকা অপমান করিল।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া পাখিগুলিকে সে নিজ হাতে খাওয়াইল, একটা বিড়াল ছানাকে আদর করিল, তারপর লছমীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, আমায় তোরা খুব ভালবাসিস, না?

লছমী লেজ নাড়িতে নাড়িতে প্রভুর ডান হাতের আঙুল কামড়াইয়া দেয়।

জনমেজয় হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলে, ভ্যালা রে পীরিত, তুই বেটি কামড়ে দিলি আমায়? একটু পরে আবার বলে, মানুষের চেয়ে তবু তুই ভাল, মানুষ কামড়ালে রক্ত বের করে তবে ছাড়ে।

লছমী ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল।

প্রভু লছমীকে আদর করিতেছে দেখিয়া লেজ ফুলাইতে ফুলাইতে অভিমানিনী আহ্লাদি প্রতিবাদ জানাইল, মিউ মিউ।

জনমেজয় তার গলার নীচে হাত বুলাইয়া বলিল, ম্যাও।

একদিন গণেশ আসিয়া বলিল, আমি তোর পাশের ঐ জায়গাটায় বসব জনমেজয়।

জনমেজয় উত্তর করিল, একটা ঘরে বরং দুটো সাপ থাকতে পারে, কিন্তু একই জমির উপর দুটো ভিকিরির জায়গা হতে পারে না।

পাশে চওড়া মাঠ পড়ে আছে, আমি যদি এক ধারে বসি ?

জনমেজয় বাধা দিয়া বলে, না, না, তা হ'তে পারে না।

বেশ তবে এইখানটায়ই হবে।

জনমেজয় কোন উত্তর করিল না।

গণেশ বলিল, তখন কিন্তু বলিস নে, আমি খোঁড়া মানুষ, আমার জায়গাটা ছেড়ে দে ভাই।

জনমেজয় উত্তর করিল, সে বান্দা আমি নই রে বেটা, মানুষ খুন করে আমার বাবা দ্বীপান্তরী হয়েছিল।

পরদিন প্রত্যুষে জনমেজয় আসিয়া দেখে, তার জায়গাটায়—চৌরাস্তার ঠিক মোড় জুড়িয়া—গণেশ বসিয়া আছে, আর একটা ভাঙা টিনের কৌটা তুলিয়া ধরিয়া ক্রমাগত চেঁচাইতেছে, খোঁড়া নাচারকে—

রাগে জনমেজয়ের সর্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। সে বলিল, আমার জায়গায় বসেছিস যে গণশা ?

জায়গাটা তোর বাপের কেনা, না ?—বলিয়াই গণেশ একটি সুবেশ ভদ্রলোকের উদ্দেশে জনমেজয়ের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া বলিল, খোঁড়া নাচারকে—

জনমেজয় গর্জন করিয়া উঠিল, ওঠ্ শালা, জল্‌দি ওঠ্ বলছি।

দূর ন্যাংচা, বলিয়াই গণেশ থুক করিয়া জনমেজয়ের উদ্দেশে খানিকটা থুতু ছুঁড়িল।

তবে রে শুয়ার, বলিয়া জনমেজয় তার মাথায় মোটা লাঠি দিয়া জোরে আঘাত করিল। ঠক্ করিয়া একটা শব্দ হইল। ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল। গণেশের মনে হইল চারিদিক অন্ধকার।

কিন্তু নিমেষের মধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বাঘের মতন জনমেজয়ের উপর লাফাইয়া পড়িল।

উভয়েই রক্ত-পাগল। একে অপরের মাংস কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইবে, টুঁটি টিপিয়া মারিবে, এই যেন তাদের সঙ্কল্প।

রাস্তায় ভিড় জমিয়া যায়, কেহ এই দৃশ্য উপভোগ করে, কেহ বা সহানুভূতি প্রকাশ করে, এদের কেউ ছাড়িয়ে দেয় না কেন ?

একজন বলিয়া উঠিল, ভিখারির জমিদারি নিয়ে লড়াই চল্‌ছে রে···

কথাটা শুনিয়া জনমেজয় থমকিয়া দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখিল, গণেশের সারা শরীর রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে। তার নিজের শরীরেরও অনেক জায়গায় ফাটিয়া গিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

সে ভাবিল, এই এক হাত জমিতে বসিবার জন্য এ কি কাণ্ড তাহারা করিতেছে।

তার এই অসতর্ক মুহূর্তে গণেশ তার মাথায় একখানা থান ইঁট ছুঁড়িয়া মারিল।

*　　*　　*　　*

প্রথমে হাসপাতাল—তারপর জেল।

জেল হইল উভয়ের পাঁচ মাস করিয়া। গণেশ ও জনমেজয়কে একই ভ্যানে আদালতে আনা হইত—শাস্তি হইবার পর একই ভ্যানে তারা সেন্ট্রাল জেলের দিকে চলিল।

দুইটা বিবদমান বিড়লাকে এক খাঁচায় পুরিলে তারা যেমন পরস্পরকে আক্রমণ করে না, অথচ নিষ্ফল আক্রোশে একে অপরের দিকে চাহিয়া ঘর্ ঘর্ শব্দ করিতে থাকে, ইহারা দুজনও পরস্পরের দিকে তেমনি করিয়া চাহিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিতে লাগিল।

সেন্ট্রাল জেলের বাহিরে গঙ্গার উপরের জমিটায় গণেশ ও জনমেজয় মাটি কোপায়। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে গা দিয়া ঘাম ঝরে। রাজশাসন ও দেবতার দান কোনটা যে বেশি নিষ্করুণ বোঝা মুশ্‌কিল। মাথার উপরে রাষ্ট্রের উদ্যত খড়্গ আর লোমকূপের মধ্য দিয়া প্রবেশ করে আগুনের ফুলকি। জনমেজয় বলিল, এই সূয্যি, একে আবার বলে দেবতা! কি করুণা রে!

গণেশ বলিয়া উঠিল,—বৃষ্টি হয় ওর জন্য, শস্য হয় ওর জন্য, আমরা বেঁচে আছি···

থুড়ি। তোর সঙ্গে কথা বলি নি, বলছি, ঐ, ঐ—এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও নিকটে না দেখিয়া গণেশ আপনা আপনিই বলিতে লাগিল, ঐ

যে গঙ্গায় যারা চান করছে। ওরা আমার চেনা—ঐ রামলোচন—আমি কথা বলছি ওর সঙ্গে।

জনমেজয় হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আমরা বড় বোকা, ভিক্ষের খুদ-কণা নিয়ে একদিন ঝগড়া করেছি তা কি হয়েছে—আমরাও ত' মানুষ।

গণেশ একটা অস্পষ্ট শব্দ করিল।

আবার কথা বন্ধ হয়, উভয়েরই কেমন একটা সঙ্কোচ কেমন যেন বাধ-বাধ ভাব থাকিয়া যায়।

জনমেজয় স্থির করিল, খালাস হইয়া গণেশকে লইয়া গিয়া নিজের জায়গায় বসাইবে। নিজে সে বুড়া হইয়াছে, অত লোভ ভাল নয়, বরাত থাকিলে ভিক্ষা অন্যত্রও জুটিবে। মানুষ চলে নিজের বরাত লইয়া, কোনও একটা বিশেষ জায়গা কিংবা কোন মানুষ সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু ভাগ্য গড়িয়া দিতে পারে না।

একদিন শেষ্ায় সমস্ত সঙ্কোচ উপেক্ষা করিয়া সে গণেশকে বলিল, এবার ও জায়গাটায় বসবি তুই।

গণেশ বলিল, যাঃ যাঃ, তোর জায়গায় আমি বসব কেন ?

জনমেজয় বলিল, জায়গা আমার বাপ-পিতাম'র নয়।

ইহা লইয়া তর্কও চলিল দু-একদিন। জনমেজয় বলিল, বুড়ো মানুষ হয়েও একফালি জমির জন্য ঝগড়া করেছি তোর সঙ্গে। ভারি ছোটলোক আমি, নাঃ— ?

খালাস হইবার তিনদিন আগে গণেশের কলেরা হইল। রোগের সূত্রপাতেই দেখা গেল কতগুলি অরিষ্ট লক্ষণ। জনমেজয় হাসপাতালে গিয়া সেবা করিতে চাহিলে কর্তৃপক্ষ তাকে ধমক দিলেন।

সাড়ে তিন ঘণ্টা ভুগিয়া গণেশ মারা গেল। জনমেজয় খবরটা শুনিয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িল—এই মানুষটার মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী। সে-ই তাকে মরণের পথে এই জেলে ঠেলিয়া দিয়াছে।

জনমেজয় জেল হইতে বাহির হইল ভারাক্রান্ত মন লইয়া। আজ সে শুধু খোঁড়া নয়, তার মেরুদণ্ডও কে যেন ভাঙিয়া দিয়াছে।

ফটকের নিকটেই গঙ্গা। সে গঙ্গায় নামিয়া স্নানান্তে তিন অঞ্জলি জল লইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবা সূয্যি, গণেশ যদি আবার আসে তাহলে আসে যেন রাজপুত্তুর হয়ে।

সে এবার মঞ্জুরীর বাড়ির দিকে চলিল। মঞ্জুরী তার বহুদিনের পরিচিত এক ভিখারিণী, কুকুর বিড়াল ও পাখিগুলিকে সে তার কাছে রাখিয়া যায়। কয়েকটি টাকা দেয় তাদের খরচের জন্য। ঐ সামান্য টাকা কয়টিতে এই কয় মাস নিশ্চয়ই চলে নাই, হয় ত' সে গিয়া দেখিবে সেগুলি না খাইয়া মরিয়াছে অথবা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে—তার সেই লক্ষ্মী ও রানীর দল।

যাইতে যাইতে কিসের টানে যেন জনমেজয় বাঁ দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করে। এই পথের শেষেই চৌরাস্তার সেই মোড়ে ভিক্ষার স্থান। তার ইচ্ছা হইল, জায়গাটা দেখিয়া যায়।

মোড়ে পৌঁছিয়া দেখিল ফুটপাথের উপর ভারা বাঁধিয়া একদল মিস্ত্রি সেই জায়গার উপর দেয়াল তুলিতেছে—দেয়ালটা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে প্রায় চার হাত। দেয়ালের পিছনে ভিতর দিকে উঠিতেছে একটা মস্ত বাড়ি।

খানিকক্ষণ সে হাঁ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল—একটু দূরের মরা নদীটা যদি ঐ পর্যন্ত আসিয়া জমিটাকে নিজের গর্ভে বিলীন করিয়া লইত, তাহা হইলেও সে এর চেয়ে বেশি বিস্মিত হইত না।

এই সেই জমি—যে-টাকে সে মনে করিত তার আপনার—এই সম্পত্তির জন্যই সে মারামারি রক্তারক্তি করিল—

তার মনে পড়িল গণেশকে, মনে পড়িল তার শেষ কথা।

গণেশের মৃত্যুর পর একটি ছোকরা ডাক্তার আসিয়া জনমেজয়কে বলে, কলেরার রোগীটি মরার ঠিক আগে বলে গেছে ছাপ্পান্ন নম্বরকে ব'ল সে যেন ঐ জায়গাটায় নিজে বসে—আর কাউকে যেন বসতে না দেয়।

তীর্থযাত্রা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মেঘনার জল কালীদহের মতো কালো। কালো কালো ঘূর্ণি যেন সাপের মত কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। টলমল করে উঠেছে এতবড় ভাওলী নৌকোখানা। নরোত্তম বললে, হুঁশিয়ার ভাই হুঁশিয়ার।

কঠিন মুঠোতে হালের আগা আঁকড়ে ধরে ফরিদ মাঝি তাকালে আকাশের দিকে। উত্তরে যেখানে তীরতটের কাছে গাঙ-শালিকের ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে আর নিরবচ্ছিন্ন খানিকটা সবুজ অরণ্যকে দেখা যাচ্ছে ঝাপসা ভাবে, ঠিক ওইখানে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের রাশ জমে উঠেছে। ফরিদ মাঝি জানে লক্ষণটা ভালো নয়। কালো কালিন্দীর মতো মেঘনার জল থেকে কালীয়নাগের বিষ-নিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে যে কোন মুহূর্তে ওই হাঁসের পাখার মতো মেঘ কষ্টিপাথরের রঙ ধরে দিগদিগন্তকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। তারপর মাতাল মেঘনা তো রইলই।

ঘূর্ণির আকর্ষণে ভাওলী নৌকো থরথর করে কাঁপছে। নিজের অজ্ঞাতেই নরোত্তমের একখানা হাত চলে গেছে মলিন পৈতার গুচ্ছের ভেতরে। নাঃ—নিজের প্রাণের ভয় করে না নরোত্তম! জীবন তো পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো, একদিন টপ করে ঝরে যেতে পারে। দেহতত্ত্বের গানে বলেছে, ধুলোর দেহ একদিন ধুলো হয়ে যাবেই—কালের অনিবার্য করাল স্পর্শকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না কোনোদিন। ধুলো না হয়ে দেহটা জলে জলাঞ্জলি হয়ে গেলেও নরোত্তমের দিক থেকে আক্ষেপ নেই কিছু। কিন্তু এতগুলো প্রাণীকে জলে ডুবিয়ে মারলে যে মহাপাতক এসে তার ওপরে অর্শাবে, তার জন্যেই নরোত্তম খুব বেশি পরিমাণে চিত্ত-চাঞ্চল্য বোধ করছে।

—ও মাঝি ভাই, হুঁশিয়ার। দেখো, সবশুদ্ধ জলে ডুবিয়ে মেরো না যেন।

ক্যাঁচ্। নৌকোটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাল ঘুরে গেল। বিন্দু বিন্দু ঘামে ফরিদের দু'হাতে কঠিন মাংসপেশী দুটো জ্বলছে—শক্তি আর

আত্মবিশ্বাসের প্রতীক! করকরে ভাঙা-গলায় ফরিদ বললে, তুমি চুপ করে বসো না ঠাকুর। পাঁচপীরের নাম নিয়ে পাড়ি ধরেছি—যা করবার আল্লা করবেন।

ফরিদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল নরোত্তম। লোকটা দেখতে কুৎসিত। শুধু কুৎসিত নয়—ভয়ঙ্কর। পুরু পুরু প্রকাণ্ড ঠোঁট দুটো কাত্‌লা মাছের মত বাইবের দিকে ঝুলে পড়েছে। অসংখ্য লাল লাল শিরায় রেখাঙ্কিত চোখে যেন একটা ক্ষুধার্ত বন্য জন্তুর পিঙ্গল হিংস্রতা। গায়ে আর কপালে রাশি রাশি ব্রণের ক্ষতচিহ্ন! নিষ্ঠুর উদ্দাম মেঘনার সঙ্গে যেন কোথায় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে লোকটার।

কিন্তু পাঁচপীর! বিশাল মেঘনার দিকে তাকিয়ে যেন আশ্বাস পায় না নরোত্তম। শুধু পাঁচপীরেই কুলোবে না। এই নদী পাড়ি দিতে তেত্রিশ কোটি দেবতার দরকার—নইলে উনপঞ্চাশ পবনকে ঠেকাবে কে? একটা বরুণ-মন্ত্র জানা থাকলে সুবিধে হত, জপ করা যেত এই সময়ে। ময়লা পৈতার ভেতরে নরোত্তমের আঙুলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল!

নৌকোয় অনেকগুলি প্রাণী। সবাই মিলে তারস্বরে কোলাহল জুড়ে দিয়েছে তারা। নরোত্তমের মেজাজ আরো বেশি করে বিগড়ে গেল। একা কত দিক সামলানো যায়!

ভাদ্রের ভরা গাঙ্। আকাশে শরতের নীলাঞ্চল মায়া ছড়িয়েছে। দূরে আধডুবো চরের উপরে চিকচিক করছে সোনা মাখানো বালি, স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠেছে কাশের ফুল। পাড়ের কাছে গাঙশালিকের ঝাঁক উড়ছে। আশ্বিন আসন্ন।

পূর্ব-বাংলার নদী দিয়ে এই সময়ে চলাচল করে অসংখ্য ভাউলী নৌকো—নরোত্তমের এই নৌকোখানার মতো। ঘরে ঘরে দুর্গাপূজা—আনন্দ-মুখরিত শারদীয়ার আয়োজন! দেশবিদেশ থেকে ব্যবসায়ীরা বড় বড় নৌকোয় বোঝাই দিয়ে পাঁঠা বিক্রি করতে আনে। মহিষমর্দিনী চণ্ডিকার মহাপ্রসাদ।

কিন্তু তেরশো পঞ্চাশ সালের আশ্বিন মাস। বাংলার সীমান্তে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়েছে—মেঘনার উত্তর দিগন্তে মহানাগের বিষ-নিশ্বাসের মতো! এসেছে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। ভাঙা-চণ্ডীমণ্ডপে সাপ আর শেয়াল এসে বাসা

বেঁধেছে। বোধনতলায় ছড়িয়ে আছে নরমুণ্ড। দেবী এবার আদৌ মর্ত্যে আসবেন কি না পঞ্জিকায় উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁর দোলা-চৌদোলা যে আগে থেকেই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ করবে কে? শাস্ত্র বলেছে, ফল মড়কং।

তাই পাঁঠার নৌকোয় এবার পাঁঠা নেই। এবার নতুন পদ্ধতিতে দেবী-পূজার ব্যবস্থা। শহরের পূজামণ্ডপে ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্ত স্বর্ণযজ্ঞের আহুতি। বাংলার ঘরে ঘরে মঙ্গল-প্রদীপের শিখা নিবে গেছে, ছায়াকুঞ্জের নিচে সোনার পল্লীতে কল্যাণী গৃহবধূর কাঁকন আজ আর ছলভরে বেজে উঠছে না। ব্ল্যাক-আউটের দিনেও নিবে যাওয়া তুলসীতলার প্রদীপ সহস্র ছটায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহানগরীর গণিকা-পল্লীতে। সন্ধ্যাশঙ্খের শেষ পরিণতি হয়েছে ঘুঙুরের শব্দে, হারমোনিয়ামের বেতালা মত্ততায়, মাতালের জড়িত চিৎকারে। যুদ্ধের কন্ট্রাক্ট যাদের রাতারাতি গৌরীসেনের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে, আজ সোনার বাংলা তাদের কাছে প্রতিফলিত হয়েছে সোনালী মদের ফেনিল পাত্রের ভেতরে।

নতুন পুজোর নতুন ব্যবস্থা। দেবী আর ভোলা মহেশ্বরের ভিখারিণী গৃহিণী নন—কুলত্যাগ করে তিনি কুবেরের অঙ্কলক্ষ্মী হয়েছেন। বাংলার নারীত্বও তাই আজ বিশ্বমাতার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করেছে। যাজন-যজন নরোত্তমের পৈতৃক ব্যবস্থা, নতুন কালের হাওয়ায় তার রূপান্তর ঘটেছে। পাঁঠার নৌকোয় একদল নারী বোঝাই দিয়ে নরোত্তম বিক্রি করতে চলেছে শহরে। শ্মশান বাংলার গ্রামে গ্রামে রিক্ত মহেশের দীর্ঘনিশ্বাস ঘূর্ণি হাওয়ায় কেঁদে বেড়াচ্ছে।

নৌকোর ভেতরে কলহ কোলাহল আর দাপাদাপি। ভাউলীখানা বাঁদিকে কাত হয়ে পড়ল। বলিষ্ঠ মুঠিতে নৌকোর হালে মোচড় দিয়ে ফরিদ বললে, তোমার সোয়ারীদের একটু থামাও না ঠাকুর। যে হট্টগোল বাধিয়েছে। ঝড় আসবার আগেই ওরা ডুবিয়ে দেবে দেখছি।

ছইয়ের ভেতর মুখ বাড়িয়ে দিলে নরোত্তম।

—এই কী হচ্ছে ওখানে? একটু ক্ষান্ত হয়ে বোসো না সবাই।

কিন্তু ক্ষান্ত হবার মতো মনের অবস্থা নয় কারো। তের থেকে ত্রিশ পর্যন্ত নানা বয়সের এক দঙ্গল মেয়ে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাদুড়ের ছানার

মতো ঝুলে রয়েছে তিন চারটি শিশু। নরোত্তমের মতো এরা নিতান্তই অনাবশ্যক বোঝা, কিন্তু বর্জন করবার উপায় নেই। কালো কালো জীর্ণ দেহ কতকগুলো মানবের সমষ্টি। দেখলে বাৎসল্য জাগে না, পা ধরে টেনে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে মেঘনার অথই জলের মধ্যে। আরো যত বিড়ম্বনা ওই অপোগণ্ডগুলোকে নিয়েই।

ছোট ছেলেটাকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে চিৎকার করছে সরলা। ছেলেটার অঙ্গ-সংস্থান দেখলে মনে হয় কারো অসতর্ক খেয়াল কালো চামড়ায় ঢাকা অসংলগ্ন কতকগুলো অপরিণত অবয়বকে জুড়ে দিয়েছে এক সঙ্গে। ঘাড়ে পিঠে দগদগ করছে ঘায়ের চিহ্ন—চোখ মেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকলে ঠেলে যেন বমি আসতে চায়। কিন্তু ওই বিকৃত জীবনটা-কেই ঐকান্তিক ক্ষমতায় আঁকড়ে রেখেছে সরলা—বাইরের এতটুকু কাঁটার আঁচড় অবধি যেন সইতে দেবে না।

—তুমিই এর বিচার করো ঠাকুর। অমন ভালোমানুষ সেজে বাইরে বসে থাকলে চলবে না।

—কী বিচার করব আবার?—খেঁকিয়ে উঠল নরোত্তম।—জোড় হাত করে বলছি, জিভে শান দেওয়াটা একটু বন্ধ রাখো সকলে। শুকনো ডাঙায় উঠে যত খুশি চেঁচিয়ো, কিন্তু এখন—

সরলা কিন্তু থামতে চায় না। অদ্ভুত গলা—কানের মধ্যে শাণিত হয়ে বিঁধে যায় এসে। মাথার রুক্ষ চুলগুলো ঘাড়ের ছ'পাশে গোছায় গোছায় ভেঙে পড়েছে—যেন রক্ষাচণ্ডীর মূর্তি। দেখে নারাত্তমের ভয় করে।

—জানি, জানি, সুখীর ওপরেই তোমার যত নেকনজর। ওকে একটা কথা বলতে গেলেই তোমার বুক চড়চড় করে ফেটে যায়। অতই যদি এক-চোখোমি, তা'হলে ওকে নিয়ে মনের সাধে নৌকা-বিলাস করলেই তো পারো। সবগুলোকে এক নৌকায় তুলেছ কেন?

—আহা-হা থামো না। কেন এমন করে চিৎকার করছ, থামো না। —গলার স্বর শান্ত আর কোমল করবার চেষ্টা করলে নরোত্তম—বোঝই তো সব, একসঙ্গে চলাফেরা করতে গেলে—

আড়চোখে নরোত্তম তাকালো সুখীর দিকে। আঠারো-উনিশ বছরের সুশ্রী মেয়ে। জাতে জেলে, কিন্তু মুখের শ্রী-ছাঁদ দেখলে সে কথা মনে

হয় না কারো। বাইরে নৌকোর গায়ে কালো জল খেলা করছে, তার নির্নিমেষ চোখ দুটো নিবদ্ধ হয়ে আছে সেই জলের ওপর। নিজের ভেতরেই যেন একান্তভাবে নিমগ্ন হয়ে আছে সে। তাকে কেন্দ্র করে এত কলহ আর কোলাহল, কিছুই যেন তার কানে যাচ্ছে না।

দেখে অদ্ভুত একটা মায়া হল নরোত্তমের। মেয়েটার ভেতরে এমন একটা কিছু আছে যা সমস্ত মনকে অকস্মাৎ যেমন ব্যথিত, তেমন পীড়িত করে তোলে। কিন্তু কী করতে পারে নরোত্তম? ব্যবসা ব্যবসাই, তার ওপরে কারো কোনো কথা চলে না।

সরলার চিৎকারের কিন্তু বিরাম নেই।

—খামোকা? খামোকা আমি চেঁচিয়ে মরছি, না? জিজ্ঞেস করো না তোমরা ওই আদরের সুখীকে। আমার ছেলের গায়ে ঘা, আমার ছেলে মরে যাবে? তোর গায়ে ঘা হোক হারামজাদী, তুই মর—মর—মর—

মট্ মট্ করে আঙুল মট্‌কাবার শব্দ কানে এল। সরলার চোখ রাক্ষসীর মতো জ্বলছে। চমকে ছইয়ের বাইরে গলা টেনে নিলে নরোত্তম। যেন সরলার অভিশাপটা সাপের ফণার মতো উদ্যত হয়ে উঠে ঠকাস্ করে তারই বুকে একটা ছোবল মারবে।

দুর্বল গলায় নরোত্তম বললে, যাচ্ছ একটা ভালো কাজে, কালীঘাটে মা কালীর দরবারে। কিন্তু যা আরম্ভ করছ তাতে মাঝ গাঙে নাও ডুবিয়ে তবে তোমরা ছাড়বে।

হালের মাচায় ফরিদ মাঝি পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে নিশ্চল হয়ে। উত্তরের আকাশে পেঁজা তুলোর মতো যে মেঘের টুকরোটা দেখা দিয়েছিল, হাওয়ার মুখে আবার যেন তা দিকচিহ্নহীন নীলিমার বুক বেয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। গাঙশালিকের ঝাঁক চক্রাকারে ঘুরছে মাথার ওপর। গলুয়ের সামনে বসে যে দু'জন মাল্লা দাঁড় টানছে, তাদের পিঠে শুকনো ঘামের ওপর চিকচিক করছে শাদা শাদা লবণের বিন্দু।

কাত্‌লা মাছের মত প্রকাণ্ড মুখখানায় খানিকটা ভয়ঙ্কর হাসি ফুটিয়ে তুলেছে ফরিদ।

—আর ভয় নেই ঠাকুর। ঝগড়ার চোটেই তুফান পালিয়েছে। যা সোয়ারী তুমি নিয়েছ, মেঘনার সাধ্য নেই যে এদের গিলে হজম করতে পারে।

—তা ঠিক।—অন্যমনস্ক ভাবে হেসে বিড়ি ধরালো নরোত্তম।

সত্যি এ এক মহা ঝকমারির কাজ। পরোপকার করতে গেলেও বিঘ্ন অনেক, অনেক বিড়ম্বনা। গাঁটের কড়ি খরচ করে সে এদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে, কালীঘাটে কালী দর্শনও করাবে, তাতেও তো মিথ্যে নেই কিছু। তারপরে? তারপরে যা হবে তার জন্য তো আর দায়ী করা চলে না নরোত্তমকে। দেশ-গাঁয়ে পড়ে থেকে ভিটে কামড়ে মরে যাচ্ছিল সমস্ত, তার চাইতে এ সহস্র গুণে ভালো। তাদের গড়া সংসার তো দুর্ভিক্ষের একটা দমকাতেই ভেঙে পড়েছে। ঠুন্‌কো আত্মসম্মান; পেটে ভাত না পড়লে যে তার একটুকুও দাম নেই, এ সত্য নরোত্তম ভালো করেই জানে।

তাছাড়া এমন দোষই বা আছে কোনখানে। কলকাতায় যারা এই জীবনকে মেনে নিয়েছে সহজ ভাবে, কেমন সুখে আছে তারা। শহরের সমস্ত বড়লোক তাদের পায়ের তলায় মাথা বাঁধা দিয়ে বসে আছে। রাত্রির আলোয় তাদের রঙ্‌মাখা মুখগুলো দেখে অপ্সরা বলে মনে হয়, ঋষি-মুণিরও বিভ্রম জাগে তাতে। গায়ে জড়োয়ার গয়না, দামী দামী শাড়ির চটক। ওদের একটি হাসির জন্যে মানুষ ভিটে-মাটি বন্ধক দেয়, ওদের অবজ্ঞার অপমানে লাখপতি আত্মহত্যা করে। ঘুঁটেকুড়ুনি থেকে রাজরানী হতে পারে সবাই, নরোত্তমের সান্ত্বনা শুধু যৎকিঞ্চিৎ দালালী ছাড়া আর কিছুই নয়। নিঃস্বার্থ সেবাব্রত ছাড়া আর কোন আখ্যা দেওয়া চলে একে?

ফরিদ হাসে।

—ভালো ব্যবসা তোমার ঠাকুর। ধান চাল পাটের চাইতে ঝক্কি ঢের কম, কাঁচা পয়সা অনেক বেশি। আগে জানলে কে এমন করে নৌকা ঠেলে মরত?

নৌকোর ভেতর দিকে আড়চোখে তাকালো নরোত্তম। সন্ত্রস্ত গলায় বললে, চুপ চুপ।

ফরিদ তবুও হাসছে। কিন্তু সত্যিই কি হাসছে! ওর চোখ দুটো দেখে নরোত্তমের সন্দেহ হল।

—তুমি তো বামুন? সমাজের ইজ্জত বজায় রাখা তোমার কাজ। ঘরের পর ঘর উজাড় করে মেয়েদের বিক্রি করে দিচ্ছ পেশাকারদের কাছে—সমাজের মুখে হাজার বাতির রোশনাই জ্বলে উঠছে নিশ্চয়।

নরোত্তম জবাব দিল না, কথাটা সে যেন শুনতেই পায়নি নীরবে চিন্তাকুল মুখে সে শুধু বিড়িটা টেনে চলল। ফরিদের কথায় মাথার মধ্যে হিন্দুত্বের রক্ত চন চন করে উঠল একবার। এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধাবার মতো সময় এ নয়, মনের অবস্থাও নয়। কিন্তু হিংস্র উন্মত্ত নদীর কাণ্ডারী ওই লোকটা ইচ্ছে করলেই পাঁকের মধ্যে নৌকো ফেলে দিয়ে সবশুদ্ধ এক সঙ্গে পাতালপুরীতে পৌঁছে দিতে পারে।

ফরিদ আবার বললে, ঠাকুরমশাই, মরে তুমি বেহেস্তে যাবে।

নরোত্তম তবু জবাব দিল না। বলছে বলুক। ও সব ছোট কথায় কান দিতে গেল অনেক কাল আগেই সব ছেড়ে ছুড়ে নিশ্চিন্ত হতে হত। বিপন্ন নারীর একটা সুবন্দোবস্ত করে দিলে পাপ হবে এমন কথা শাস্ত্রে লেখা নেই কোথাও! কিন্তু ফরিদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। শাস্ত্রের গভীর রহস্য যবনে কেমন করে বুঝবে?

মেঘনার মেঘবরণ জল প্রশান্ত মন্থর গতিতে চলেছে সমুদ্রের দিকে। অজস্র হাওয়ায় রাশি রাশি ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, নদীর বুকে ফুটছে ফেনার ফুল। যেন কালীয়নাগের হাজার ফণা ছোবল তুলছে একসঙ্গে। মহানাগের কুণ্ডলীর মতো এখানে ওখানে চক্রাকারে 'উলাস' দিচ্ছে শুশুকের দল। নৌকোর পচা কাঠ আর জলের একটা মিষ্টি গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে বাতাস।

নৌকোর ভেতর থেকে গুনগুন করে একটা গানের আওয়াজের মতো কানে আসছে। সরলার চিৎকার থেমে গেছে, কিন্তু গান গাইছে কে? সাগ্রহে কান পাতল নরোত্তম। না, গান নয়। সুমতি কাঁদছে। তারই চোখের সামানে তার স্বামী একরাশ বুনো লতা চিবিয়ে ভেদবমি হয়ে মরেছে সেই শোকেই কাঁদছে।

কাঁদছে—কাঁদছে। নরোত্তমের মেজাজ যেন সপ্তমে চড়ে যায়। কেন কাঁদে, কার কাছে কাঁদে? কে আছে কান্না শোনবার জন্যে? অথচ সবাই কাঁদছে। মরবার আগে সপ্তমে চেঁচিয়ে কাঁদ্ছে, মরবার সময় অব্যক্ত যন্ত্রণায়

গুমরে গুমরে কাঁদছে। তবু ভালো, মরবার পরে মানুষের কান্না শোনা যায় না। তা'হলে সে কান্নার শব্দে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যেত।

গুনগুন করে সুমতি কাঁদছে। নরোত্তমের দু'হাতে কান চেপে ধরতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে গলার ভেতর একটা গামছা ঠেসে দিয়ে সে কান্না বন্ধ করে দেয় সুমতির। তাদের পাশের গাঁয়ে একবার একটা খুন দেখেছিল নরোত্তম। সম্পত্তির লোভে বিধবা বড় ভাজের গলার ভেতর একখানা আস্তো থান কাপড় ঠেলে দিয়েছিল ছোট দেবর। মেয়েটার অস্বাভাবিক হাঁয়ের চেহারা দেখে তাকে মানুষ মনে করবার উপায় ছিল না, চিরে যাওয়া গালের দু'পাশ দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত নেমে তার গলা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছিল। উঃ, কত রকম বিভৎস ভাবেই যে মরতে পারে মানুষ! এই দুর্ভিক্ষের সময় পূর্ব-বাংলার গ্রামে গ্রামে যে তার রঙবেরঙের ছবি দেখেছে।

ঝপ ঝপ ঝপাস্। পাশ দিয়ে বারো দাঁড়ের একখানা ছিপ বেরিয়ে যাচ্ছে! মেঘনার জল থেকে উঠে আসা প্রেতমূর্তির মতো একদল অস্থিসার মানুষ দুর্বল হাতে দাঁড় টেনে চলেছে। বড় ভাউলীখানা দেখে বারো জোড়া কালি-মাখানো চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল।

সমস্বরে প্রশ্ন এল ঃ চাল আছে নৌকায়?

—না।

—ধান আছে?

—না।

বারো জোড়া হাতের দাঁড়ের টানে ছিপ এসে ভিড়ল ভাউলীর গায়ে। পাটাতনের ভেতর থেকে দু'তিনটি ল্যাজার ফলা ঝিকিয়ে উঠল একসঙ্গে।

—ধান চাল থাকে তো না দিয়ে এক পা এগুতে পারবে না।

হালের মুখে ফরিদ মাঝির পেশী কঠিন হয়ে উঠেছে।—হুঁশিয়ার। নৌকোয় সব-জেনানা। ধান-চালের দরকার থাকে অন্য তল্লাটে যাও, একটা দানাও মিলবে না এখানে।

পৈতে আঁকড়ে ধরে নরোত্তম দুর্গানাম জপছে, নৌকোর ভেতর থেকে উঠেছে মেয়েদের কান্না। কিন্তু একটিবার ভেতরে উঁকি দিয়েই বারো জোড়া চোখের আগুন নিবে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

—জাহান্নামে যাও।—বারোটি কণ্ঠে চাপা অভিসম্পাত। ঝপ ঝপ ঝপাস্। বারো দাঁড়ের ছিপ স্রোতের টানে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

নরোত্তমের ঠোঁট তখনো থরথর করে কাঁপছে। বড় রক্ষা পাওয়া গেছে এ যাত্রা। প্রাণে আর বল ছিল না, বুকের রক্ত শুকিয়ে গিয়েছিল একেবারে। ল্যাজা দিয়ে ফুঁড়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই।

—ব্যাটারা ডাকাত নিশ্চয়।

কুশ্রী কুৎসিত মুখে ফরিদ ভয়ঙ্কর একটা হাসি হাসল।

—হ্যাঁ ঠাকুর, ওরা ডাকাত। তোমার মতো সাধু ফকির নয়।

সাধু ফকির! কথাটা কানে গিয়ে লাগে। সন্দিগ্ধ চোখে ফরিদের দিকে তাকালো নরোত্তম। হাঁ, ঠাট্টাই করছে। কিন্তু যা বলে বলেই যাক—উত্তর দেবার সময় এখনো আসেনি।

পালে জোর বাতাস লেগেছে, তর্‌তর্‌ করে ঢেউ কেটে বেরিয়ে চলেছে নৌকো। চরের ওপর শাদা কাশবনে চখা-চখি উড়ছে। বহু দূরে কোথা থেকে ভেসে আসছে ঢাকের অস্পষ্ট শব্দ। আজ থেকে কি মহাপুজোর বোধন লাগল?

উপরে নির্মেঘ নীল আকাশ। বাংলাদেশের শরৎ যেন তার স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন আঁখি মেলে দিয়েছে। সোনার শরৎ! ঘরে ঘরে নতুন ধান—নবান্নের শুভ-সম্ভাবনা। ফুলে আর পাতায় পদ্মদীঘির জল দেখা যায় না। শিশির আর শেফালী ফুলের গন্ধ মেখে বাংলার মাটি যেন শারদার পূজামণ্ডপ।

কিন্তু সে কোন্ বাংলা? কবেকার বাংলা, কত শতাব্দী আগেকার? এখানে মেঘনার জল কালীয়নাগের নিশ্বাসে কালো হয়ে গেছে। এখানে মড়কে জর্জরিত বাংলার বুক থেকে গৃহচ্যুত গৃহলক্ষ্মীরা পণ্য হতে চলেছে শহরের গণিকা-পল্লীতে। অভিশপ্ত শরৎ—দুঃস্বপ্নের শরৎ। ভিখারি মহেশ্বরের গৃহিণী আজ কুলত্যাগিনী।

নৌকোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সুখী দাঁড়িয়েছে নরোত্তমের পাশে। তার দু'গাল বেয়ে টপটপ করে চোখের জল পড়ছে।

—কিরে সুখী, হল কি তোর?

—ঠাকুরমশাই, ছেড়ে দাও আমাকে। দোহাই তোমার—আমাকে ছেড়ে দাও।—দু'হাতে নরোত্তমের পা জাড়িয়ে ধরেছে সুখী।—আমি তীর্থদর্শন করতে চাই না, আমি কলকাতা যেতে চাই না। আমাকে বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এসো!

—আহা-হা, কেন পাগ্‌লামি করিস!—সন্ত্রস্ত হয়ে টেনে পা সরিয়ে নিলে নরোত্তম। বাপের কাছে ফিরে যাবি। কী করবি সেখানে গিয়ে? না খেয়ে শুকিয়ে মরবি যে।

—মরি মরব। আমার সেই ভালো ঠাকুরমশাই। আমি কলকাতায় যাবো না। আমাকে ছেড়ে দাও—আমি চলে যাই।

—ছেড়ে দেব!—সুখীর অসঙ্গত আবদারে বিস্ফারিত চোখে নরোত্তম তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। দেড়শো টাকা বাপকে গুনে দিয়ে তবে মেয়েটিকে আনতে হয়েছে। সেই দেড়শো টাকা সুদে-আসলে একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে! যতই ধর্মে মতি থাকুক না, নরোত্তম দাতাকর্ণের পোষ্যপুত্র নয়।

সুখীর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়ল নরোত্তমের পায়ের ওপর! কী উষ্ণ জলটা—সমস্ত শরীর তার স্পর্শে যেন চমকে উঠেছে। অপূর্ব সুন্দর সুখীর মুখখানা। নরোত্তমের মনটা হঠাৎ যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

অনেক দূরে নদীর ওপারে গ্রামের আভাস। কত আশা, কত স্বপ্ন দিয়ে গড়া মানুষের আশ্রয়। কিন্তু কি আছে ওখানে? রিক্ত ধানের মরাই ভেঙে পড়েছে মাটিতে। উড়ছে শকুন। ওখানে ফিরে যেতে চায় সুখী। কী করবে গিয়ে? আরো দশজনের মতো না খেয়ে ছটফট করে মরে যাবে, নয়তো মেঘনার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সমস্ত দুঃখের অবসান করবে। তার চাইতে—

—আচ্ছা, এখন চুপ করে বোস তো গিয়ে। ঘাটে নৌকো লাগুক তারপরে দেখা যাবে।

কিন্তু ঘাট কোথায়! নদী চলছে তো চলেইছে! বাঁকের পর বাঁক ঘুরছে, পেছনে ফেলে যাচ্ছে খাড়া পাড়ি। ভেঙে-পড়া গ্রাম। সন্ধ্যার আগে আর কোনো বাজার বা গঞ্জ পাওয়া যাবে না।

নৌকোর ভেতরে কোলাহলের বিরাম নেই। সুমতি কাঁদছে, সরলার ছেলেটা চিৎকার করছে। এক গা দগদগে ঘা নিয়ে ছেলেটা বাঁচবে না, কবে যে চোখ উল্টে শেষ হয়ে যাবে তারও ঠিক নেই। তবু অসীম মমতায় সরলা ওই বিকৃত শিশুটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছে। বিরক্তিতে নরোত্তমের সমস্ত মনটা বিষাদ আর বর্ণহীন হয়ে যায়। ওদিকে মালিনী সুর টেনে কৃষ্ণযাত্রার গান ধরেছে। দলের ওই মেয়েটা যা একটু হাসি-খুশি—নিজের সম্বন্ধে ভাবনা নেই, দুশ্চিন্তাও নেই কিছু। অল্পবয়সে বিধবা হওয়ার পরে গাঁয়ের অনেকগুলো ছেলের সে মাথা খেয়েছে এই রকম জনশ্রুতি শুনতে পাওয়া যায়। তাকে আনবার জন্যে নরোত্তমের বেশি কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি, এক কথাতেই সে প্রসন্ন-মুখে নৌকোয় উঠে এসেছে।

—'কালো রূপে মোর মজিল যে মন, ঝাঁপ দেব কালো যমুনায়'—

মালিনী বেরিয়ে এসে বসেছে ঠিক নরোত্তমের পাশটিতে।

—জলের রঙটি দেখেছ ঠাকুর? ঠিক যেন কালো যমুনা।

—হুঁ!

—আমি রাধা হলে ঠিক ওই জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম—অপূর্ব একটা ভ্রূভঙ্গি করে হাসল মালিনী: তারপর ঠাকুরের যে বাক্যি হরে গেল। আমার মুখের দিকে একবার তাকালেও দোষ নাকি?

—না, না, অমন কথা কে বলে!—জোর করেই হাসবার চেষ্টা করলে নরোত্তম: কিন্তু মতলবটা কী?

—একটা পান খাওয়াতে পারো না? সকাল থেকে পান না খেয়ে মাথা ধরে গেল যে।

—এখন কোথায় পাবে পান? একটা ঘাট আসুক, তার পরে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

—তুমি বড় বেরসিক ঠাকুর! 'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না'—চটুল একটা কটাক্ষপাত করে লীলায়িত ভঙ্গিতে ভেতরে চলে গেল মালিনী।

নরোত্তম একটার পর একটা বিড়ি টেনে চলেছে বিষণ্ণ মুখে। সুখীর জন্যেই ভাবনা। মেয়েটা চুপ করে বসে, নির্নিমেষ চোখ মেলে চেয়ে থাকে জলের দিকে। সরলা, সুমতি কিংবা অন্যান্য মেয়েদের জন্যে চিন্তার কিছু

নেই। যতই হট্টগোল করুক, শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া চলবে। কিন্তু সুখীকে বিশ্বাস নেই, ওর চোখের জলকে বিশ্বাস নেই। কখন ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে মেঘনার কালো জলের মধ্যে, ঘটাতে পারে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড।

তাই নরোত্তম আগে থকেই সুখীর জন্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। গোলাম মহম্মদের সঙ্গে কথা হয়েছে তার।

আরো দুটো বাঁক পেরোলেই কাশীপাড়ার চক। সেখানে ঘন কাশবনের ওপারে কী আছে দেখা যায় না। আর সেইখানেই খালের মাথায় মিলিটারী কলোনীর ঠিকাদারের নৌকো থাকবার কথা।

কিন্তু মনের দিক থেকে কেমন যেন জোর পায় না সে। সুখীর কথা ভাবলেই একটা অন্যায়—একটা বিচিত্র অপরাধ-বোধ এসে যেন তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। মেয়েটার মুখখানা সত্যিই ভারী সুন্দর। নরোত্তমের মাঝে মাঝে লোভ হয়, এক একটা দুর্বল মুহূর্তে ভাবে—

হঠাৎ নৌকোর মধ্যে সরলার তুমুল চিৎকার। কলহের কলরোল নয়, বুকফাটা ডুকরে কান্না।

—কী হয়েছে, হল কি ওখানে? ডাকাত পড়ল নাকি?

—না।—মালিনীর গলা ভেসে এসেছে ঃ না। সরলার ছেলে মরে গেছে।

কান্না আর হট্টগোল। তবু নরোত্তমের মনটা খুশি হয়ে উঠেছে—যেন একটা ভার নেমে গেছে চেতনার ওপর থেকে। ছেলেটা মরে গেছে, বোঝা কমেছে একটা। একে একে সবগুলো ছেলেপিলে অমনি করে মরে শেষ হয়ে যেতে পারে না? নৌকোর ভার কমে, শান্তি ফিরে আসে অনেকখানি। তাছাড়া চিরযৌবনের রাজ্যে সবৎসার চাইতে অবৎসার কদর বেশি।

মরা ছেলেটাকে সরলা বুক থেকে নামাতে চাইছে না। আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদছে। কাঁদুক। শহরের আলোয় ওই কান্না মিলিয়ে যেতে কতক্ষণ লাগবে? সেখানে চিরবসন্তের দেশ। রাত্রির অপ্সরাদের চোখে কখনো জল দেখতে পায় না কেউ।

আর ফরিদ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তুফানের কোনো সংকেত নেই সেখানে, কিন্তু তার মনের প্রান্তে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। একটা কিছু ভাবছে, কিন্তু স্পষ্ট কোনো রূপ দিতে পারছে না।

তীর্থযাত্রীদের নৌকো চলেছে কালীঘাটে দেবতা দর্শনে! কুবেরের পূজা-মণ্ডপে নতুন কালের নতুন বলি। কণ্ট্রাক্টের টাকায় ফেঁপে উঠেছে নারীমাংসের কশাইখানা। নরোত্তমের মতো পরহিতব্রতীর সান্ত্বনা দালালীর কয়েকটা টাকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাথার ওপরে শরতের নির্মল নীলিমা। দূরে বোধনের বাজনা। অকাল বোধন নয়, আকাল বোধন। কিন্তু কে জাগবে এই বোধন মন্ত্রে? চৌরঙ্গীর হোটেলে সে আজ রঙ-মাখানো মুখে মদের গেলাসে চুমুক দিয়েছে।

বাঁকের পর বাঁক ঘুরে নৌকো। দূরে চলেছে যেখানে ঘূর্ণি হাওয়ায় লাল বালি উড়ছে, ওইখানে কাশীপাড়ার কাশবন। আস্তে আস্তে নৌকো এসে ভিড়ল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলে নরোত্তম, দূরে মিলিটারী কলোনীর ঠিকাদারের নৌকোর মাস্তুল ঠিক আছে।

—সুখী, সুখী।

প্রত্যাশায় সমুজ্জ্বল মুখে সুখী এসে দাঁড়ালো। গালের দু'পাশে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুর চিহ্ন। নরোত্তম কানে কানে বললে, এখানে তোকে নামিয়ে দিলে চলে যেতে পারবি? নদীর পার দিয়েই সোজা রাস্তা—

অগ্র-পশ্চাৎ ভাববার মতো মনের অবস্থা নয় সুখীর। সমস্ত প্রাণ তার চিৎকার করে কাঁদছে। বাবাকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না, থাকতে পারে না তার ছোট ভাইটিকে ছেড়ে। না খেয়ে যদি মরতে হয়, সবাই একসঙ্গেই মরবে। তবু সে যাবে না কলকাতায়। মা-কালী দর্শন করে তার কোনো লাভ নেই।

ঘন জঙ্গল আর কাশবন। ওপারে দৃষ্টি চলে না। নরোত্তম বললে, চল, তোকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসি। নদীর ধারে উঠলেই সোজা শড়ক।

কাশবনের মধ্যে অদৃশ্য হল দু'জনে। নরোত্তম বললে, একটু দাঁড়াও মাঝি ভাই, আমি আসছি।

কিন্তু ফরিদ নিদারুণ ভয়ে চমকে উঠেছে। সমস্তা মাথাটা ঝিমঝিম করছে তার। এ কী? কী করছে সে? যে অস্ত্রে শাণ দিচ্ছে এক দিন সে অস্ত্র কি ওর নিজের গলাতেই এসে লাগতে পারে না? গ্রামে তারও স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে। ছেলের বউ আছে। আজ যদি সে মরে যায়? কাল টাকার লোভে আর একজন যে এমনি করে তাদের নিয়ে

মেঘনা পাড়ি দেবে না কে বলতে পারে? ফরিদের সমস্ত শিরাস্নায়ুর মধ্যে আগুন জ্বলে। নরোত্তম ঠাকুরের মতো লোকের অভাব হয় না কোথাও—কোনোদিন।

ভয়ংকর মুখখানাকে আরো ভয়ংকর করে ফরিদ হাঁক দিলে মাল্লাদের।

—রহিম, কামাল, এদিকে আয় দেখি। তামাক সাজ তো এক ছিলিম।......

কাশবনের ওপারে রহস্যময় নীরবতা। হঠাৎ সেই নীরবতা ভেঙে সুখীর আর্ত চীৎকার: ছাড়ো, ছাড়ো, বাঁচাও আমাকে—

চমকে ফরিদের হাত থেকে আগুনশুদ্ধ কলকেটা পড়ে গেল মেঘনার জলের মধ্যে। ও কার কান্না? মনে হল তার মেয়েই যেন চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে। তার মেয়ে, তার স্ত্রী, আরো কত জন।

কিন্তু পরক্ষণেই সব নিস্তব্ধ। আর কাশবন ঠেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে নরোত্তম।

—মাঝি, মাঝি, শিগ্‌গির নৌকো ছেড়ে দাও। মস্ত কুমির। কাশবন থেকে বেরিয়ে সুখীকে মুখে নিয়ে জলে নেমে গেল।

মেয়েরা এক সঙ্গে আতঙ্কে কিলবিল করে উঠেছে। এমন কি সরলার কান্না পর্যন্ত গিয়েছে থেমে।

—কুমির?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—মস্ত কুমির।—গোলাম মহম্মদের দেওয়া নোটগুলো ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে নরোত্তম লাফিয়ে উঠে পড়ল নৌকোতে, আর এখানে দাঁড়িয়ে কাজ নেই। হায় হায়, সুখীর কপালে এই ছিল—

ছইয়ের ওপর থেকে লম্বা একখানা লগি টেনে নিলে ফরিদ। কুৎসিত মুখে একটা অমানুষিক হাসি হাসল।—কত বড় কুমির ঠাকুরমশাই? কী নাম?

নরোত্তম কিছু একটা জবাব দেবার আগেই প্রচণ্ড বেগে লগির ধারালো খোঁচা তার চোখে এসে লাগল। উলটে নৌকো থেকে কাদা আর বালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নরোত্তম। একটা চোখ কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে, আর একটা অন্ধ হয়ে গেছে কচ্‌কচে বালিতে।

ভাউলী নৌকো ততক্ষণে অথই জলে। দূর থেকে ফরিদের করকরে গলা কানে ভেসে এল : এতখানি সহ্য হয় না ঠাকুরমশাই। না খেয়ে মরে তো মরুক, তবু গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়ে ফিরে নিয়ে যাবো।

মূর্ছিতের মতো একরাশ জল-কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো নরোত্তম। ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু উঠতে পারছে না। ওদিকে অদূরে জলের মধ্যে ভেসে উঠেছে পোড়া কাঠের মত একখানা প্রকাণ্ড মুখ—তার দুটো চোখে জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে নরোত্তমকে লক্ষ্য করছে। অন্ধ না হলে নরোত্তম দেখতে পেতো ওটা সত্যি সত্যিই কুমির।

ছিন্নমস্তা

নবেন্দু ঘোষ

কোর্ট-কম্পাউণ্ড্‌কে দূর থেকে দেখা গেল। পাঁচিল-ঘেরা এলাকার মধ্যে কোর্টের নানা বিভাগ। বড় বড় অট্টালিকার ভিড়, ছোট শহরের মাঝে তা সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

মহাদেব বলল, "উই দেখা যাচ্ছে কোট, বুঝল ভিখারীর মা ?"

বত্রিশ চৌত্রিশ বছরের একটি মেয়েলোক, অন্যান্য রাজবংশী মেয়েদের মতই দেখতে। শরীরে কাঠামোতে ভাঙন ধরেছে, তবু বোঝা যায় যে এককালে তার গঠন বেশ ভালো ছিল। রাজবংশী পুরুষের রক্ত তখন হয়ত উদ্দাম হয়ে উঠত তাকে দেখে; হয়ত নির্জন মধ্যাহ্নে, পুকুর থেকে চান করে ফিরবার সময় বাঁশবনের ছায়াঘন পথে কোনো দুঃসাহসী যুবক তাকে দুটো রসালো কথা বলার জন্য আকুল হয়ে উঠত। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন গাল দুটো ভাঙা, মাথার চুল উঠে যাবার উপক্রম করেছে, ছোট্ট একটা গিঁট বেঁধে সেগুলো ঘাড়ের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। পাহাড়ীদের মত ছোট ছোট চোখ, কিন্তু শীর্ণ আকৃতি হওয়ায় সেগুলো একটু বড় দেখায়, ঔজ্জ্বল্য নেই—আছে ঘোলাটে, প্রাণহীন ভাব। এককালে রং ফর্সা ছিল। কিন্তু এখন তা তামাটে। ছিল মাংসের পুরু আস্তরণ, কিন্তু রোদে-জলে আর অর্ধাহারে ও অনাহারে তা ক্ষয়ে গেছে; তার বদলে হাড়ের উপর একটা পাতলা চামড়াই মাত্র অবশিষ্ট আছে। বিধবা, কিন্তু গায়ে যে এককালে অলঙ্কার শোভা পেত তার চিহ্ন রয়েছে কানের আর নাকের ওপর। পরনে তালি-দেওয়া সযত্নে সেলাই-করা ময়লা, মোটা শাড়ি, হাঁটুর এক বিঘৎ নিচে পর্যন্ত গিয়েই তার দৈর্ঘ্য শেষ হয়ে গেছে। এই ভিখারীর মা।

মহাদেব বলল, "দেখলা, কোট দেখলা ভিখারীর মা ?"

ফুক্‌ফুক্ বিড়ি টানতে টানতে লোচন ঘোষ অবজ্ঞার সুরে বলল; "কোর্ট—তা কি এমন দেখার জিনিস হে ?"

মহাদেব বিনীতভাবে বলল, "আয় বাপ্, কোট কি যা তা ব্যাপার গো মাহাজন? আইনের কুঠি হইল ইটা—আয় বাপ!"

ভিখারীর মা কোনো বলল না, শুধু নিঃশব্দেই চলতে লাগল, মন্থর গতিতে। কোর্টের দিকে দৃষ্টি ফেরাল সে, ত্রাস আর আতঙ্কের একটা কালো ছায়া ঘনীভূত হল তার চোখের তারায়, ফাটা-ফাটা কাল্‌চে ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠল! যেন বিভীষিকা দেখল সে, যেন অতিকায় একটা রাক্ষস এসে দাঁড়াল তার মুখোমুখি। কোট! আয় বাপ্!

ভাদ্র মাসের রোদ ইতিমধ্যেই বেশ চন্‌চনে হয়ে উঠেছে। গায়ে জ্বালা করে, ঘাম হয়, দু'পাশের রগ দপ্ দপ্ করতে থাকে। সূর্যালোক প্রতিফলিত আয়নার মত নির্মেঘ আকাশটা, তার দিকে এই বেলা দশটার সময়েই আর তাকাবার উপায় নেই। কোর্টের ফটক দিয়ে উকিল, মোক্তার, মক্কেল, কেরানী এরই মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে; ফটকের বাইরে বসে গেছে দোকানদারেরা তাদের মনিহারী জিনিস নিয়ে, কলা, কমলা ও বিড়ি দেশ্‌লাই নিয়ে।

তেলতেলে ঘামে ভিখারীর মার মুখটা চক্‌চক্ করছে। ললাটের ওপর চোখের কোণে কুঞ্চিত রেখা দেখা দিয়েছে: কি যেন ভাবছে সে।

মহাদেব তার ছেঁড়া শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিড়ি খুঁজছে। কিন্তু কোথায় বিড়ি? ছাপোষা মানুষ, চার আনার বেশি পয়সা আনতে পারেনি, বৌ খেঁকিয়ে উঠেছিল। সেই চার আনা পয়সা চট করে খরচ করতে মন চাইছে না তার। ট্রেনভাডা দিয়েছে ভিখারীর মা; তার কাজে এসেছে বলে, কিন্তু সব অবস্থা জানার পর মহাদেব তার কাছে বিড়ির খরচা চায় কি করে? অথচ একটা বিড়ি চাই-ই এখন। কাঁচাপাকা চুলের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে সে লোচন ঘোষের দিকে তাকাল।

পায়ে কেম্বিসের জুতো; গায়ে গলাবন্ধ কোট, কাঁধে সিল্কের চাদর, গলায় তুলসীর মালা, কদমছাঁট পাকা চুলে ভর্তি মাথায় দোহারা গড়নের একটা টিকি আর শকুনির মত তীক্ষ্ণ, কুটিল চাউনি ও শীর্ণ আকৃতি। এই লোচন ঘোষ। এক হাজার বিঘার জোতজমি আছে যার, যার রহনপুরে আছে চালু গোলা। সেই লোচন ঘোষ এখন বাঁ বগলে ছাতাটা চেপে ধরে হাঁটছে। ছাতাটা পুরানো—কারণ তার কাপড়ের রঙ এখন ছাইয়ের মত হয়ে এসেছে

আর এখানে সেখানে মাকিন কাপড়ের পট্টি পড়েছে। হাঁটছে আর ফুক্‌ফুক্‌ করে বিড়ি টানছে লোচন ঘোষ।

মহাদেব ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল, "মাহাজন"—

লোচন ঘোষ তাকাল, "কি বলছিস রে?"

যেন কোন রাজার গোটা রাজ্যকেই সে অন্যায়ভাবে চাইছে—এমনি একটা অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল মহাদেবের মুখে। প্রায় অস্ফুট গলায় সে প্রার্থনা জানাল, "একটা বিড়ি দ্যান না গো মাহাজন"—

লোচন ঘোষ কটমট করে তাকাল মহাদেবের দিকে। জ্বলন্ত বিড়িটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে মহাদেবের হাতে দিল, শ্লেষোক্তকণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "পরের ঘাড় ভেঙে কি নেশা চলেরে হতভাগা—অ্যাঁ?"

বিড়িটা মুখে দিয়ে সলজ্জ হেসে মহাদেব বলল, "দেশলাইটো মাহাজন"—

"দেশ্‌লাইটাও রাখিস না গাড়োল—তুই কি!" জ্বলন্ত বিড়িটাকে এগিয়ে দিল লোচন ঘোষ।

মহাদেব সযত্নে বিড়িটা ধরিয়ে নিল।

কোর্টের ফটকটা এসে পড়ল। হঠাৎ ভিখারীর মা থমকে দাঁড়াল, তার শরীর যেন অবশ হয়ে এল, একটা বিরাট অজগর মুখের মত মনে হল ফটকটাকে। তার আতঙ্কবিহ্বল ঘোলাটে চোখের ওপর একটা জলের পরদা চিক্‌ চিক্‌ করে উঠল।

লোচন ঘোষ এগিয়ে গিয়েছিল। পেছন ফিরে ভিখারীর মাকে দাঁড়াতে দেখে সে বিরক্ত হয়ে বলল, "ওকি দাঁড়ালু ক্যানে গে ভিখারীর মা—আয়, আয়, টাইম হয়া গিছে যে"—

নড়ে উঠল ভিখারীর মা, পা টেনে টেনে চলতে লাগল সে—খোঁড়া কুকুরের মত। অসহায়, যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টিটা সামনের দিকে প্রসারিত। দেখে মনে হল যেন বধ্যভূমিতে প্রবেশ করেছে সে, যেন কোনো ঘাতকের খড়্গকে দেখতে পেয়েছে, অনিবার্য একটা বিয়োগান্ত পরিণতির আঁচ পেয়ে যেন তার প্রাণটা সভয়ে নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সাব-রেজিস্ট্রারের দপ্তরখানা। একতলা বাড়ির চারটে ঘর জুড়ে তাঁর অফিস। জমি কেনাবেচার নাটকীয় ব্যাপারটা এই ঘরগুলোতেই ঘটে

আসছে বহুদিন ধরে। অফিসের বাইরের দেয়াল লাল রঙয়ের। বাইরে আম গাছ তিন চারটে, সে-গুলির ডালে কাক আর বকের বাসা। গাছের নিচে ছেঁড়া মাদুর আর সতরঞ্জি বিছিয়ে মুহুরিরা বসে আছে। তাদের সামনে ছোট ছোট জলচৌকি, স্ট্যাম্প-যুক্ত দলিলের কাগজ, কালির কাচের দোয়াত, মোটা নিবের কলম আর ছেঁড়া ব্লটিং কাগজ। ইতিমধ্যেই ভিড় জমেছে সেখানে। মাদুর আর সতরঞ্চির একপাশে মাটির ওপর উবু হয়ে বসে আছে ক্রেতা বিক্রেতারা। হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই। মুখের চেহারা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়—কে জমি কিনছে আর কে বিক্রি করছে। এক দলের শুক্‌নো মুখ, উদাস দৃষ্টি; অন্য দলের উজ্জ্বল মুখ, চঞ্চল দৃষ্টি। সেখান থেকে কয়েক হাত দূরে একটা লোক চানাচুর বিক্রি করছে; তার পাশে আর একটা লোক বসে আছে চিড়ে, ছাতু, গুড়, নুন লঙ্কা আর জল ও বাসন নিয়ে।

সেখানেই ওরা এসে দাঁড়াল।

লোচন ঘোষ চারদিকে তাকাল। চেনা মুহুরি পেলেই কাজটা তাড়াতাড়ি হবে। কম দিলেও চলবে, আবার ধরাধরি করে হাকিমের কাছে তাড়াতাড়ি কবালাটা পেশ করাও যাবে।

একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে কালোমত যে লোকটা বিড়ি টানতে টানতে অন্যান্য মুহুরিদের কর্মব্যস্ততার দিকে তাকিয়ে ছিল আর মনে মনে শাপশাপান্ত করছিল সে হঠাৎ লোচন ঘোষকে দেখতে পেল। তার ওখানে একটা লোকও তখন ছিল না। খুব উৎসাহিত হয়ে পরমাত্মীয়ের মত মিষ্টি গলায় সে হাঁক দিল, “আচ্ছা ঘোষমশাই যে! আসুন, আসুন, নমস্কার”—

লোচন ঘোষ দেখতে পেল কালো লোকটাকে। নরহরি দাস। ব্যস্; চেনা লোক পাওয়া গেছে আর লোকটা কাজও করে ভালো।

“কি নরহরি, ভালো আছো তো?”

“তা আপনাদের আশীর্বাদে আছি একরম। তারপর, কি ব্যাপার? আহা, বসুন, বসুন—” নরহরি হঠাৎ গোঁড়া বৈষ্ণবের মত উদার ও ব্যস্ত হয়ে উঠল।

লোচন ঘোষ তাকাল ভিখারীর মার দিকে, বলল, “বস্ গো ভিখারীর মা—এইঠি বস্”—

ভিখারীর মা কোনো কথা বলল না। সতরঞ্চির বাইরে, বিরল ঘাসে ঢাকা মাটির উপর সে বসে পড়ল—হাঁটুর ওপর ডান কনুই রেখে, গালে হাত দিয়ে। তার দৃষ্টিটা সামনের মানুষ ও কোর্টের দেয়াল ভেদ করে, শহর পেরিয়ে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলে গেছে; গিয়ে থেমেছে তার বিন্নাঘাসের ছাউনি দেওয়া ছোট্ট মাটির ঘরে। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে তার মধ্যে ম্লানমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ভিখারী, ন্যাড়া আর কাদু। ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ভাবছে মায়ের কথা। একটু নড়ে উঠল ভিখারীর মা, ছেলেমেয়েদের ছবিটাকে সে যেন সহ্য করতে পারল না, দৃষ্টিটাকে সে ফিরিয়ে নিল, নিঃশব্দে এবার মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

মহাদেব সতরঞ্চির এককোণে বসে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আইনের কুঠি ইটা, কোট, আয় বাপ্ !

লোচন ঘোষ বলল, "একটা কবালা করা দ্যাও না হরি, দু'বিঘা পাঁচ কাঠা মাটির।"

"কার নামে?"

"ভিখারীর মার নামে—হ্যাঁরে, তুর কি নাম লেখা হবু ভিখারীর মা?"

ভিখারীর মা যেন চমকে উঠল, তাকাল লোচন ঘোষের দিকে, মাথার ওপরকার কাপড়টা একটু টেনে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, "গঙ্গা—গঙ্গাকুমারী বর্মণ"—

"ইস্ট্যাম্পের দাম দিন ঘোষমশাই"—নরহরি হাত পাতল।

লোচন ঘোষ টাকা বের করে দিল। নরহরি একটা দলিলের কাগজ টেনে লিখতে আরম্ভ করল।

চিড়ে আর গুড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল মহাদেব। ভিখারীর মার দিকে মুখটা ঘুরিয়ে সে বলল, "শুইনছ গো ভিখারীর মা, শুইনছ"—

ভিখারীর মা তাকাল। নিঃশব্দে।

"খিদা লাইগ্‌ছে যি"—

ভিখারীর মা লোচন ঘোষের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "দুই তিন আনা পাইসা দ্যান গো মাহাজন—মহাদেবদা চিড়া খাভে"—

খেঁকিয়ে উঠল লোচন; কুৎসিত মুখভঙ্গি করে বলল, "এখ্‌খনি খাভে? ক্যানে? বলি, বেলা আর কি এমন হইল রে?"

মহাদেব তবু বলল, "বাঃ, খিদা লাইগ্ছে তো করমু কি ?"

"ব্যাটা গাড়োল কোথাকার"—পকেট থেকে দু'আনা পয়সা বের করে মহাদেবের দিকে তা ছুঁড়ে দিল লোচন ঘোষ।

তা কুড়িয়ে নিয়ে মহাদেব বলল, "ইয়াতে কি হবু ? আর এক আনা দ্যান"—

"যা যা ব্যাটা রাক্ষস কোথাকার, দু'আনার চিড়া খায়া জল খাগা, প্যাট ঢাক হয়া উইঠ্বে।"

"না না, দ্যান"—নাছোড়বান্দার মত মাথা নাড়ল মহাদেব।

কি একটা অশ্লীল কথাকে আটকে নিল লোচন ঘোষ। একটু ভেবে নিয়ে আরো দু'আনা পয়সা বের করে বলল, "লে, চাইর্ আনার চিড়া কিনা লে—ভিখারীর মাকেও দিস্"—

"ন"—ভিখারীর মা যেন শিউরে উঠল, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, "হামি খাবু না যি"—

মহাদেব বাকি পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে গেল, চিড়ের দোকানের দিকে।

নরহরি জিজ্ঞেস করল, "কত দর গো ঘোষমশাই ?"

লোচন ঘোষ মহাদেবের উদ্দেশে গালিবর্ষণ করল, "শালা"—

নরহরি ভ্রূকুঞ্চিত করল, "মানে ?"

লোচন ঘোষ হাসল, "আহা তোমাকে না হে, উই শালা গাড়োলটাকে বুলছি। দর ? তা লেখ একশো টাকা করা। দু'বিঘা পাঁচ কাঠার দাম হইল তোমার গিয়া তবে দু'শো পঁচিশ টাকা, ঠিক কিনা ?"

নরহরি লিখতে লিখতে মাথা ঝাঁকাল, "হুঁ, ঠিক। হ্যাঁ, ভিখারীর মার স্বামীর নাম কি ?"

ভিখারীর মা লোচন ঘোষের দিকে তাকাল।

লোচন ঘোষ বলল, "নিতাই বর্মণ—মারা গিছে।"

"আচ্ছা এবার খতিয়ান দেখি—"

ভিখারীর মা নিজের আঁচলের গিঁট খুলে দুটো জীর্ণ ভাঁজকরা কাগজ বের করে দিল। একটা খতিয়ান, অপরটা চেক দাখিলা। নরহরি সেগুলো খুলে সামনে রাখল, তারপর আবার লিখতে লাগল।

মাটির দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ভিখারীর মা। এখানকার মাটি

একটু কালো, একটু কাঁকর-মেশানো। তবু মাটি। শান্ত, সহিষ্ণু, মমতাময়ী মায়ের মত। ছবি ভাসে ভিখারীর মার ঘোলাটে চোখের সামনে। মেহেরপুর গ্রাম থেকে এক মাইল দূরে, ডাঙ্গাপাড়ার উত্তর দিকে, সাতটা তালগাছ যেখানে সপ্তরথীর মত মাথা খাড়া করে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে—সেইখানটাতেই বিস্তৃত হয়ে আছে দু'বিঘা পাঁচ কাঠা মাটি। সরকারী পুকুরটার উঁচু পাড় ঘেঁষে পুবে পশ্চিমে বিস্তৃত আছে তা। মাখনের মত নরম, সাদা বীজকে সতেজ চারায় পরিণত করার উপযুক্ত, ঐন্দ্রজালিক প্রাণরসে ভরাট ও উর্বর। বিস্তৃত হয়ে আছে মাটি শরতের আকাশের নিচে, ভাদ্দুরে রোদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর সেই মাটিকে আজ বিক্রি করছে ভিখারীর মা। বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে সে। কেন? হাসল ভিখারীর মা। সে এক বিচিত্র কাহিনী।

স্তিমিত হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি। কুটিল স্রোতের নাগপাশ যেন তাকে টেনে নিচ্ছে কোনো অতল নদীর গর্ভে। ডুবে মরার আগে সমস্ত জীবনটা যেন ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভিড় করে আসে তেমনিভাবে সব কিছু দেখতে পেল ভিখারীর মা।

ছিল, সব ছিল। জোয়ান স্বামী, কোলভরা ছেলেমেয়ে, সারা বছরের ধান আর পরনের কাপড়—কোনো অভাবই ছিল না। জমি ছিল—পাঁচ বিঘা পাঁচ কাঠা। একজোড়া বলদ করেছিল নিতাই, নিজেই হাল চালাত। সবুজ চারা মাথা বের করত মাটির ভেতর থেকে, বড় হত, সবুজ শোভায় ঝলমল করত, হাওয়ায় দুলত, ক্রমে পেকে সোনার মত রঙ হত তার। তারপরে ধানকাটা, মাড়াই, সেদ্ধ করা, ঢেঁকিতে কুটে চাল তৈরী করা। পঁচিশ থেকে ত্রিশ মণ ধান হত জমিতে। দু'তিন কাঠা জমিতে তরিতরকারিও চাষ করত নিতাই, তা নিয়ে হাটে বিক্রি করত। অবসর সময়ে দড়ি পাকাত, আমের সময় বাগান থেকে আম কিনে চড়া দামে বেচত। বেশ চলে যাচ্ছিল দিন। সে প্রায় আঠারো বছর আগেকার কথা, যখন তার বিয়ে হয়েছিল নিতাইয়ের সঙ্গে। তারপর দুটো ছেলে হল পর পর। মারা গেল তারা। সুখে দুঃখে দিন কাটতে লাগল। দিনের বেলা স্বামী ক্ষেতে, হাটে কাজ করত; সে রান্না করত, ঘর লেপত, বাসন মাজত, মা লক্ষ্মীর পুজো করত। আর রাতের বেলা সব সেরে টেরে স্বামীর বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয়ে গিয়ে ঘুমোত।

ছোট শিশুর নির্ভরশীল ভাবটা তার মুখে ফুটে উঠত। ঠোঁটের কোণে দেখা দিত পরিতৃপ্তির মিষ্টি হাসি। স্বামীর বুকে মিশিয়ে গিয়ে সে তখন গভীর রাতের নূপুরধ্বনি শুনত, শুনত শেয়ালের প্রহর ঘোষণা—

নরহরি দাস তখন লিখে যাচ্ছে আর যা লিখছে তা বিড়বিড় করে আউড়ে যাচ্ছে, "জিলা মালদহ, থানা গোমস্তাপুর, মৌজা নিমইল, পরগণা চাঁদ্‌লাই, খতিয়ান নং ১৩৫, তৌজি নং ৩য়"—

লোচন ঘোষ আর একটা বিড়ি ধরিয়ে ফুক্‌ফুক্ করে টানতে লাগল, দেখতে লাগল নরহরির কলম-চালনা।

মহাদেব ফিরে এল চিড়ে-গুড়ের দোকান থেকে, এসে একটা ঢেকুর তুলে বলল, "আঃ"—

"কি রে, খালু ?" লোচন ঘোষ প্রশ্ন করল।

"হাঁ মাহাজন"—মহাদেব সহাস্যে মাথা নাড়ল।

"ভিখারীর মার চিড়া কুথায় ?"

মহাদেব লজ্জা পেল, "বাঃ ভিখারীর মা যি বুলল উ খাভে না—তাইতো হামি সব খায়া লিলাম্"—

"একা খালি !" লোচন ঘোষ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল, "একা! আচ্ছা তুই কি? অ্যাঁ?" আর কোনো কথা বলল না, প্রচণ্ড রাগে একেবারে বোবা হয়ে গেল সে। বেটা রাক্ষস, নির্ঘাত রাক্ষস।

ভিখারীর মা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, "রাগ কইরো না গো মাহাজন, হামি তো খামু না"—

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু দু'জনার খাবার যে একাই"—

লোচন ঘোষ কথা শেষ করতে পারল না।

নরহরি হঠাৎ ওপরের দিকে মুখ তুলে গাল দিল, "শালা"—

"কি হইল হে নরহরি, অ্যাঁ?" লোচন ঘোষ ভুরু কুঁচকাল।

নরহরি দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আপনাকে নয় ঘোষ মশাই—শালা কাগকে বলছি"—

"কি হইল ?"

"শালার কাগ ওপর থেকে ইয়ে করেছে, আর একটু হলেই মাথায় পড়ত"—

মহাদেব সশব্দে হেসে উঠতে গিয়েই থেমে গেল। কাজ নেই, মহাজন হয়তো রাগ করবে, অথচ তাকে রাগানোটা উচিত হবে না। স্বার্থ আছে তার।

"মাহাজন"—সে ডাকল।

"কি ?"

খুব বিনীত ও অনুগত লোকের মত নিরীহ ভঙ্গিতে মহাদেব বলল, "একটা বিড়ি দ্যান"—

"বিড়ি !" লোচন ঘোষ তেতে উঠল, "আমি কি বিড়ির দানছত্তর খুলেছি নাকি রে, অ্যাঁ ? বিড়ির নেশা অথচ বিড়ি রাখবু না সাথে—ইটা কি কাণ্ডরে বাপ্পু !"

"দ্যান মাহাজন, খায়া আইলাম বুলা চাহুছি"—মহাদেব সত্যি নিলর্জ্জ।

"তবে লে, খায়া মর্ হতভাগা"—বিড়ি ও দেশ্‌লাই বের করে এগিয়ে দিল লোচন ঘোষ।

মহাদেব বিড়ি ধরাতে ধরাতে হেসে বলল, "কিন্তু কথাটা যমে শুইন্‌লে তো মাহাজন, হামি আর হামার বৌ কি উ কথা কম কহাছি যমকে—কিন্তুক্ নাঃ, ফল হয় না"—কথাটা বোঝাবার জন্য বারকয়েক মাথা নাড়ল সে।

"হয়েছে বাপ্পু তুই থাম্, আর ঠাট্টার দরকার নাই"—

মহাদেব বুদ্ধিমানের মত চুপ করে গেল, নিঃশব্দে বিড়িটাকে সজোরে টানতে লাগল।

ভিখারীর মা মাটির দিকে তাকাল। নরম মাটি। তার মনে পড়ে—সপ্তরথীর মত সাতটা তাল গাছ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই তার জমি ; ছু'বিঘা পাঁচ কাঠা। ঢেউখেলানো ক্ষেতের শেষে যেখানে আকাশটা এসে মাটি ছুঁয়েছে সেখানে যখন কাকের ডানার মত কালো মেঘের পাহাড়কে দেখা যায়, যখন একটা কালো ছায়ার আবরণ পড়ে সেই জমির ওপর তখন তার অপরূপ শোভা দেখে মন জুড়িয়ে যায় ; ফসলের সম্ভাবনায় নিশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে। আর তারপর যখন আকাশ ভেঙে জল পড়ে, শুক্‌নো, সাদা ও কঠিন মাটির ভিজে গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে তখন দেহে রোমাঞ্চ জাগে, মনের নিভৃত কন্দরে একটা অনুভূতি জাগে যে মাটি আর মানুষ আলাদা নয়। তখন বিশ্বাস জন্মায় যে মাটিও মানুষের একটা অঙ্গ, মাটি

ছাড়া মানুষ বাঁচতেই পারে না। অথচ সেই মাটি আজ—। কিন্তু কেন?

সব ছিল। নদীর মত যে জীবন তার ওপর তারা নৌকো ভাসিয়ে চলেছিল। ঝড় উঠেছিল, বান ডেকেছিল সেই নদীতে, কুটিল কামনা নিয়ে ঘূর্ণাবর্ত এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল—কিন্তু তবু তাদের নৌকো ডোবেনি। দিন কাটছিল এমনি ভাবে। আবার সন্তান এল, একের পর এক—ভিখারী, ন্যাড়া, কাদু। তারপরে হঠাৎ একদিন প্রলয়ের অন্ধকার এল গঙ্গাকুমারীর জীবনে। নিতাই মারা গেল—অনেক ভুগে, অনেক খরচ করে, বৌ ও ছেলেমেয়েদের অসহায় অবস্থায় ফেলে।

নরহরি লিখছে, "আপনি ও আপনার বংশধরগণ উক্ত জমির রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের অধিকারী হইলেন"—

ভিখারীর মার হাতের নীল্‌চে শিরাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চাপা উত্তেজনায় নাকটা ফুলে উঠেছে। মানসচক্ষে সেই দুর্দিনের ছবিটা যেন দেখতে পেল সে যেদিন তার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল, হাতের শাঁখা ভেঙে গেল। ভিখারী সেদিন আট বছরের, ন্যাড়া ছয় বছরের, কাদু তিন বছরের। ঠিক তখন থেকেই অবস্থাটা তাড়াতাড়ি বদলাতে আরম্ভ করল। একটা পিচ্ছিল সুড়ঙ্গ-পথ বেয়ে সেদিন থেকেই রসাতলের অন্ধকারের দিকে নামতে লাগল ভিখারীর মা। তার একাকীত্বের সুযোগ পাবার জন্যই যেন ওঁৎ পেতে ছিল সব বিপদগুলো। ভবিষ্যতের কোঠা থেকে একের পর এক তারা আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

মেহেরপুরে গো-মড়কের ধুম পড়ে গেল। নিতাই বর্মণের বলদ দুটো রাতারাতি মারা গেল। স্বামী মারা যাওয়ার সময় যতটা কেঁদেছিল ভিখারীর মা তার চেয়েও বেশি কেঁদেছিল সে জানোয়ার দুটো মারা যাওয়ায়। বাধ্য হয়ে জমি বন্দোবস্ত করতে হল। মহাদেবের ছোট ভাই অবস্থাপন্ন চাষী, সে আধি চাষ করতে রাজী হল, খাতির করল না বিধবা মানুষটিকে। উপায় কি? কে আছে তার? ছেলেরা তো নাবালক।

গাঁয়ের সবচাইতে বড় জোতদার ছিল সুরেন তালুকদার। বয়স গোটা চল্লিশেক, কালো মোটামত লোকটা—স্বার্থপর, জালিয়াত, লম্পট। আর তার কাছে কিছু ঋণ ছিল নিতাইয়ের। প্রায় পঞ্চাশ টাকা। আর এই ঋণটা শোধ না করেই নিতাই মারা গেল।

একদিন দুপুরে খাওয়ার সময় হঠাৎ সুরেন তালুকদার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘোমটা টেনে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল ভিখারীর মা, কিন্তু তালুকদার ডাক দিল।

"শোনো বাছা—তুমিই কি নিতাইয়ের বৌ ?"

ভিখারীর মা মাথা নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ।"

সুরেন তালুকদার উদার হাসি হেসে বলল, "নিতাই অকালে মারা গেল, শুনে আর দুঃখে বাঁচি না। তা গাঁয়ের মানুষ, তোমরা তো আত্মীয়ের সামিল, দরকার হলে জানাবা কিন্তু"—

আবার ঘাড় নেড়ে সেখান থেকে চলে এসেছিল ভিখারীর মা।

এল ব্যাধি। ছেলেমেয়েরা একের পর এক অসুখে পড়ল।

মহাদেবের ছোট ভাই নারায়ণ আধির হিসেবে ধান দিল মাত্র বারো মণ। চোখে অন্ধকার দেখল ভিখারীর মা। মনে হল পৃথিবী বড় প্রতিকূল, বড় অন্ধকারে ভরা। তবু সাহস হারাল না, ছেলেমেয়েদের মানুষ করে একদিন সে দুঃখকে জয় করবে—এমনি স্বপ্নই দেখতে লাগল। তরিতরকারির চাষ স্বামীর মত ভালোভাবে সে আর করতে পারল না, হাটেও নিয়ে যেতে পারল না, গাঁয়েই কম দামে বেচে দিতে লাগল। সুতরাং টান লাগল। এরই মাঝে একদিন বৈশাখ মাসে ঝড় উঠল! অদৃশ্য দৈত্যলোক থেকে যেন হাজার হাজার দৈত্য ছুটে এল, গাছপালা উপড়ে ফেলল, বাড়ির চাল উড়িয়ে নিয়ে গেল, তা চাপা দিয়ে মানুষ গরুর প্রাণ নিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিখারীর মার বাড়ির চালটাও উড়িয়ে নিয়ে ফেলল পাঁচশ হাত দূরে। টাকার দরকার হল।

গুটিগুটি পা ফেলে একদিন সুরেন তালুকদারের কাছে যেতে হল।

তালুকদার তার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, "টাকা চাই ? তা বেশ। কিন্তু নিতাই এর আগে পঞ্চাশ টাকা দেনা করেছিল, সেটা জানা আছে তো ?"

ভিখারীর মা ঘাড় নাড়ল।

"সেই দেনা এখন সুদসমেত দাঁড়িয়েছে প্রায় একশো বাইশ টাকায়।"

যে ভিখারীর মা লজ্জায় ঘোমটা টেনে ছিল, কম কথা বলছিল—সেই একটু ঘোমটা সরিয়ে কথা বলে ফেলল। বলল, "এত!"

তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তালুকদার, তার দুটো পিঙ্গল চোখের তারায় আগুন ঝল্‌সে উঠল, ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে।

খুব মোলায়েম সুরে বলল, "হ্যাঁ, তাই। এ তো আজকের কথা নয়, প্রায় দু'বছর আগেকার কথা, কাগজপত্রও আছে ; সে যাই হোক্, তুমি ঘাব্‌ড়াচ্ছ কেন? অল্প অল্প করেই না হয় দেবে। আর এই নাও, কুড়িটা টাকা নিয়ে যাও আজ, আবার দরকার হলে দেব"—

কা-কা-কা—। কাকের কর্কশ চিৎকার শোনা গেল। ভিখারীর মার চমক ভাঙল।

নরহরি একোরে লাফিয়ে উঠল, "সেরেছে। শালার কাগ এবার জামার ওপর ইয়ে করেই ফেলেছে"—একটা শুক্‌নো পাতা কুড়িয়ে সে জামার হাতাটা মুছে ফেলল, তারপর বলল, "নিন ঘোষমশাই হয়ে গেছে কবালাটা, একবার পড়ে দেখুন"—

"তুমিই পড় বাপু, আমি শুনি"—লোচন বলল।

নরহরি পড়ে শোনাল। ভিখারীর মাও শুনল। সব কথা বুঝল না সে, তবু যেটুকু বুঝল তাতেই দেহ তার অবশ হয়ে এল। মরছে, তিল তিল করে মরছে সে, করাত দিয়ে কে যেন তার গলাটাকে রসিয়ে রসিয়ে কাটছে।

"নিন, এবার ভিখারীর মা আর সাক্ষীকে দিয়ে সই করান"—

মহাদেব হাসল, "আয় বাপ্‌, হাম্‌রা কি লিখা পড়হা জানি যি?"

লোচন ঘোষ মোড়লের মত বলল, "আরে না না, টিপসই দিবু তুরা"—

নরহরি কালির প্যাড বের করল। ভিখারীর মা ও মহাদেবের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ নিয়ে নিল কবালার ওপর। যন্ত্রচালিতের মত ছাপটা দিল ভিখারীর মা, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে, যেন দেহের কয়েক ফোঁটা রক্ত জমে আছে টিপসইটাতে।

"ব্যস"—নরহরি বলল, "এবার আপনি খেয়েদেয়ে আসেন ঘোষমশাই। ওরা থাক্, আমি কবালা দাখিল করে দিচ্ছি, পেশ্‌কার বাবুকে বলে দিচ্ছি যাতে হাকিমের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছয়"—

"আচ্ছা"—লোচন ঘোষ উঠে দাঁড়াল, মহাদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুরা গিয়া বারান্দায় বস্, আমি খায়া আইস্‌ছি।"

মহাদেব মাথা নাড়ল, "আচ্ছা মাহাজন"—

"ভিখারীর মা খাবু না?" লোচন ঘোষ একবার ফিরে তাকাল যেতে যেতে।

ভিখারীর মা নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। না, না। খাবার রুচি নেই তার, নেই মনে আলো। অন্ধকার, সব কিছু অন্ধকার ঠেকছে। কবালা তৈরী হয়ে গেল, টিপসই দিল সে। এবার হাকিমের সই। তারপর? তারপর নিরন্ধ্র অন্ধকার।

নরহরি তার চেনা পেশ্‌কারকে কবালাটা দিয়ে এল, হাকিমের কাছে তাড়াতাড়ি পেশ্‌ করার জন্য। ওদের দু'জনকে সে বারান্দায় উঠে বসতে বলল। যে কোন মুহূর্তে নাম ডাকবে হয়ত। মহাদেব মাঝে মাঝে উঠে ঘুরে আসতে লাগলো এদিক ওদিক। ভিখারীর মা নিঃশব্দে পাথরের মত এক কোণে বসে রইল। ভাবতে লাগল—এটা শরৎকাল, তার সাতটা তালগাছ-ওয়ালা ক্ষেতের ওপর এখন চড়া রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, শিশির-ভেজা ধানের চারাগুলো দুলছে একটু একটু, শ্যামশোভায় ঝক্‌মক্ করছে। বাতাসে ভাসছে চড়ুই আর শালিকের ডাক, কাঁচা ধানের মৃদু সুবাস, অদৃশ্য প্রাণের স্রোত। অথচ—অথচ এই ধান, এই মাটি আর তার থাকবে না—কেন?

কত কথা, কত অপমান, কত নির্যাতন সত্ত্বেও সে এই মাটিকে আঁকড়ে ছিল। কিন্তু কি হল?

বেশ মনে পড়ছে। যখন তখন সুরেন তালুকদারের সঙ্গে দেখা হতে লাগল। রাস্তায়, ঘাটে, বাড়ির সামনে। এদিকে দিনের পর দিন অভাবের মাত্রা বেড়ে গেল। খাওয়ার পরিমাণ কমল, পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেল। শেষে একদিন এক কাণ্ড ঘটল।

শীতের রাত। দিনের বেলাকার ভাত ছেলেমেয়েদের খাইয়ে ভিখারীর মা শুধু জল খেল চারটি মুড়ি দিয়ে। ছেলেমেয়েরা ঘুমোল। গাঁয়ের গুঞ্জনধ্বনি থেমে এল, কুয়াশা আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাইরের পৃথিবীটা যেন জমে এল।

এমনি সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল।

"কে?" শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ভিখারীর মা।

জবাব এল, "আমি—দরজা খোল, জরুরী কথা আছে"—

বিবর্ণ হয়ে উঠল ভিখারীর মা। সুরেন তালুকদারকে কে না চেনে? সেই লোকটা এত রাতে কি বলতে চায়?

"খোল"—আদেশের সুরে বলল তালুকদার।

হতবুদ্ধি হয়ে দরজা খুলল ভিখারীর মা।

সুরেন তালুকদার সামনে এসে বলল, "ঘাবড়ো না, কয়েকটা কথা মাত্তর, কিন্তু শীত বাইরে, একটু ভেতরে দাঁড়িয়েই না হয় কথাগুলো বলে যাই"—

কোনো উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই ভেতরে ঢুকল তালুকদার, ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে হেসে বলল, "কন্‌কনে হাওয়া আসছে ভিখারীর মা—ভয় পেয়ো না।"

আশঙ্কায় কেঁপে উঠল ভিখারীর মা, তালুকদারের মুখের ক্লেদাক্ত হাসিটা তার দৃষ্টি এড়াল না. ভাঙা গলায় সে প্রশ্ন করল, "আপনার কি দরকার, বুলেন"—

তালুকদার মাথা নাড়ল, গম্ভীর হয়ে বলল, "বলছি শোন! আমার হঠাৎ টাকার দরকার পড়েছে। তোমাদের কাছে আমার একশো বিয়াল্লিশ টাকা পাওনা—সেটা আজই দিতে হবে"—

"আজই!" টলে উঠল ভিখারীর মা। আজই! আর একশো বিয়াল্লিশ টাকা!

সুরেন তালুকদারের মুখের চেহারাটা বদ্‌লে যেতে লাগল, বিষধর সাপের চোখের মতই তার দুটো চোখ জ্বলতে লাগল। তার মিষ্টি হাসি আর উদার ভঙ্গির মুখোশটা সরে গিয়ে যেন ভেতরকার কুৎসিত চেহারাটাকে উদ্‌ঘাটিত করে দিল।

কঠিনকণ্ঠে সে বলল, "হ্যাঁ আজই চাই, এখুনি চাই।"

"তা কি করা হয় গো মাহাজন—হামি মেয়ালোক, এই রাতে কি করমু?" কাতর হয়ে বলল ভিখারীর মা।

"সে আমি জানি না"—দরজার সামনে একটা দৈত্যের মত কালো ছায়া ফেলে সুরেন তালুকদার মাথা নাড়ল।

"আর এত টাকা কুন্‌ঠে পামু মাহাজন—কুন্‌ঠে পামু?"

"ওসব তুমি বুঝবে, আমার কি?"

"একটু একটু করা শোধ দিমু মাহাজন, মাফ্‌ করা দ্যান"—

"না"—

"আপনার পায়োৎ পইড়ছি হামি—মাফ্ করা দ্যান্"—ভিখারীর মার লজ্জা উড়ে গেল, ঘোমটা সরিয়ে মিনতি জানাল সে, অসহায় বোধ করে কাঁপতে লাগল।

তালুকদার একইভাবে বলল, "মাফ্ টাফ্ করব না আমি ভিখারীর মা—হয় টাকা দাও, না তো জমি দাও তার বদলে"—

"জমি দিলে কি খামু মাহাজন ?" ভিখারীর মার পায়ের নিচেকার মাটি যেন কেঁপে উঠল। জমি বিক্রি করে দেনা শোধ করবে! কিন্তু তারপর ? ভবিষ্যৎ ? ভিখারী, ন্যাড়া আর কাদু ? সে ছাড়া কে ওদের মানুষ করবে ? আর পাঁচ বিঘা পাঁচ কাঠা জমি ছাড়া কি আছে তার ? জমি! মায়ের মত মমতাময়ী, প্রাণের মত দামী। সেই জমি বিক্রি করতে হবে ?

মাথা নেড়ে সে উন্মাদের মত বলল, "না না, জমি দিবার পারমু না হামি"—

সুরেন তালুকদার একদৃষ্টে তাকাল ভিখারীর মার দিকে, তারপর হঠাৎ ভেজানো দরজার হুড়কোটা লাগিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

তার কালো মুখে ধারালো হাসি খেলে গেল, তার চোখের পিঙ্গল মণি দুটো জ্বলতে লাগল, চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলল, "টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, জমি দিতে মায়া হয়—সব বুঝলাম। কিন্তু আমি তো দাতাকর্ণ নই, একটা কিছু আমায় দিতেই হবে—আজই"—

দৈত্যের মত কালো ছায়া ফেলে অরণ্যচর বনমানুষের মত তালুকদার এগিয়ে এল। আর্তনাদ করতে গিয়েছিল ভিখারীর মা, কিন্তু তালুকদার তাকে বোঝাল যে তার ফল আরো মারাত্মক হবে। পৃথিবীতে সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র যে টাকা সেই টাকার অভাব যার নেই সে দিনকে রাত করতে পারে, ভিখারীর মার মত অভিশপ্ত মানুষদের জ্যান্ত কবর দিতে পারে। কেঁদেছিল ভিখারীর মা, তালুকদারের ক্ষমতার অনস্বীকার্য প্রভাব উপলব্ধি করে পায়ে পড়ে সসম্মানে বেঁচে থাকার প্রার্থনা জানিয়েছিল। আর ভেবেছিল—টাকা তার নেই সুতরাং একসঙ্গে দেনা শোধ করার কথা বাতুলতা। আর জমি ? সে তো প্রাণ, সে তো জীবনের কোষাগার। সেই জমিই বা কি করে বেচে সে ? অতএব ? ছেলেমেয়েদের ঘুমন্ত মুখের

দিকে তাকিয়েছিল সে। ওদের বাঁচাতে হবে, বড় করতে হবে, তবেই ভিখারীর মার সংগ্রাম শেষ হবে! সেই সংগ্রামের মাঝে তালুকদারের লালসা একটা অস্ত্রের আঘাতের মত জ্বালাময় ক্ষত রচনা করবে। সতীত্ব ও নারীত্বের মর্যাদার চেয়েও ছেলেমেয়েরা অনেক বড়। না, সে জমি ছাড়তে পারবে না।

শীতের রাত। বাইরে কুয়াশা ঠাণ্ডা অন্ধকারের মাঝে জমাট হচ্ছে। শেয়াল ডাকছে কালীতলার ওদিকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন গ্রাম। ভৌতিক মুহূর্ত। আর এরই মাঝে একটা নরকের আগুনে স্নান করল ভিখারীর মা। আগুনে জ্বলে-পুড়ে, ঝলসেও বাঁচতে চাইল; বাঁচাতে চাইল। তালুকদার চলে যাবার পর ঠায় বসে রইল সে, একটা নিশাচরী রাক্ষসীর মত অগ্নিময় দৃষ্টি মেলে শীতের রাতের প্রহর গুনতে লাগল—

চমক ভাঙল, যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল ভিখারীর মা। নরহরি ডাকছে।

"হাকিম এসেছে, বুঝেছ ভিখারীর মা—" নরহরি ব্যস্তভাবে ছুটে এল, "একটু বাদেই ডাক পড়বে, তা ঘোষ মশাই কোথায় ?"

ঠিক সেই সময়েই লোচন ফিরে এল, পেছনে মহাদেব।

নরহরি বলল, "এই যে এসেছেন, এখুনি ডাক পড়বে। আর হ্যাঁ, চার আনা পয়সা দিন, পেশ্‌কারকে দিতে হবে"—

"আচ্ছা বাবা"—লোচন ঘোষ মাথা নেড়ে একটা সিকি বের করে দিল।

নরহরি চলে গেল, আরো লোক আছে তার ওখানে, দাঁড়াবার সময় নেই।

মহাদেব লোচনের দিকে তাকাল। খুব খেয়ে এসেছে লোকটা, জামার ওপর থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তার পেটটা ফুলে উঠেছে।

সে ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করল . "খায়া আইলেন মাহাজন ?"

"হ্যাঁ"—

"কি খাইলেন ?"

লোচন ঘোষ খেয়ে এসে একটু ঠাণ্ডা মেজাজে আছে তাই চটল না, বলল, "তা খুব খারাপ খাই নাই রে। চালটা একটু মোটা ছিল, তবে স্বাদ খারাপ নয়। কাঁচা মুগের ডাল ছিল, আলু পটল ভাজা ছিল, চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি ছিল, রুই মাছের তরকারি ছিল আর ছিল একটা টক"—

শুনতে শুনতে মহাদেবের মুখটা আলগা হয়ে গিয়েছিল, চোখ বড় হয়ে উঠেছিল, কল্পনায় সব খাবারগুলোকে দেখতে পেয়ে জিভে জল এসে পড়েছিল।

ঢোক গিলে সে বলল, "তা তো ভালই খাইলেন"—

লোচন ঘোষ মৃদু হাসল, "কিন্তু কান-মলা যে দাম নিল, বারো আনা"—

মহাদেব সমর্থনসূচক হাসি হেসে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল, আড়চোখে একবার লোচন ঘোষকে লক্ষ্য করল, তারপর হঠাৎ বলল, "মাহাজন"

"কি ?"

"একটা বিড়ি দ্যান্ গো"—

"কি ?" লোচন ঘোষের গায়ে যেন একটা ছুঁচোবাজি ছিটকে পড়ল, শরীরের রক্ত তার মাথায় চড়ে গেল, দাঁত খিচিয়ে সে বলল, "বিড়ি ! তুকে বিড়ি খাওয়াবার ভার কি ভগমান হামাক্ দিছেরে গাধা ? অ্যাঁ ?"

লোচন ঘোষের কণ্ঠের উত্তাপ যত ডিগ্রি চড়ল, মহাদেবের কণ্ঠেও ঠিক তত ডিগ্রি কোমলতা দেখা দিল, মাথা নিচু করে সে আবার অম্লানবদনে বলল, "ইবারটা দিয়া আর না দিলেন মাহাজন"—

কোর্টের ভেতর থেকে পিয়াদার হাঁক শোনা গেল—"মহেন্দ্রনাথ দাস, হাজির হো-ও-ও-ও"—

কবালা রেজিস্ট্রির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

লোচন ঘোষ অনেক ভেবে এবারও একটা বিড়ি দিল মহাদেবকে। ব্যস, এই শেষবার।

বারান্দায় লোকজনের ভিড় বেড়ে গেছে। মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মুহুরি আর ক্রেতা বিক্রেতারা পেশকারদের চারিদিকে ভিড় করে আছে। ঘুষ দিচ্ছে। দুটো বেঞ্চ রয়েছে হাকিমের মুখোমুখি, লোকেরা গাদাগাদি করে বসে আছে তাতে। মাঝখানে কাঠের রেলিং, তার পিছনে উঁচু বেদী, তার ওপর টেবিল, টেবিলের ওপাশে মস্ত বড় একটা চেয়ারে হাকিম সাহেব। তাঁর ডান পাশে একটা ঘূর্ণমান আলমারীতে আইনের বই। পেছনের দেওয়ালে, বহুদিন আগে টাঙানো সম্রাট পঞ্চম জর্জের একটা রঙীন ছবি। হাকিম সাহেবের বাঁ পাশে একটা টুলের সামনে পিয়াদা দাঁড়িয়ে আছে, হাঁক দিয়ে ডাকছে জমি-বিক্রেতাদের। ওদিকে মাথার উপরে দুলছে একটা টানাপাখা, টানছে একটা মুসলমান ছেলে, ঝিমোতে ঝিমোতে।

বিচিত্র একটা অনাত্মীয় পরিবেশ। আইনের নির্বিকার রাজ্য।

ভিখারীর মার কানের মধ্যে ঝাঁঝাঁ শব্দ হচ্ছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মত। সে ঘেমে উঠেছে।

মহাদেব তাকাল তার দিকে, মৃদুকণ্ঠে বলল, "অত চুপ করা আছিস ক্যান ভিখারীর মা?"

ভিখারীর মার নাকটা একটু ফুলে উঠল, স্তিমিত দৃষ্টিকে সামনের দিকে প্রসারিত করে সে বলল, "চুপ করা আছি"—

পিয়াদার ডাক শোনা গেল, "রামদয়াল ভকত, হাজির হো-ও-ও-ও"—

মুহুরিরা যেখানে দলিল তৈরীতে ব্যস্ত সেখানে একটা আমগাছের নিচে কিছু নধর দূর্বাঘাস ঘন হয়ে আছে। সবুজ মসৃণ ও স্নিগ্ধশোভায় মণ্ডিত—কাঁচা ধানের মত। ভিখারীর মা কেঁপে উঠল। সাতটা তালগাছ যেখানে নিশ্চল প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে, তার দুবিঘা পাঁচ কাঠা জমিতে, এখন হয়ত ধানের ওপর হাওয়ার ঢেউ খেলে যাচ্ছে, নিশ্বাসের মত শব্দ উঠছে। প্রাণের পসরা তুলে ধরেছে তার মায়ের মত মাটি! অথচ সেই মাটি আজ—! ডুবন্ত মানুষের মত সারা-জীবনের ছবি দেখে ভিখারীর মা।

সেই মাটির জন্য রাতের ঘুম তার নরকের বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। চরম অপমান ও লাঞ্ছনা সয়েছিল সে তার জন্য। জীবনে আনন্দ ছিল না, আশা ছিল না, কিন্তু ছেলেমেয়েদের বিষয়ে দুর্বলতা ছিল। আর তাদের জন্য সে দেহমন বিষাক্ত করেও জমি বাঁচাল।

কিন্তু বাঁচল কৈ তা? একমাস, দু'মাস, তিনমাস কাটল। হঠাৎ একদিন সুরেন তালুকদার আবার টাকা চেয়ে বসল। আকাশ থেকে পড়ল ভিখারীর মা, অতর্কিতে যেন ছোরা বিঁধল তার পিঠে। তালুকদার বলল যে ভিখারীর মা বিশেষ কারণেই তিনমাস পর্যন্ত সময় পেয়েছে, কিন্তু আর নয়। চোখে অন্ধকার দেখল বেচারী। কয়েকজন সহানুভূতিপ্রবণ লোকের সাহায্যে ঋণসালিশী বোর্ডকে ব্যাপারটা জানানো হল। একটা রফা হল। মাসিক দশ টাকা কিস্তিতে দেনা শোধ করতে হবে। বাঁকা হেসে তালুকদার রাজী হল।

দশ টাকা কিস্তি। প্রতিমাসে দিতে হবে। কিন্তু কোত্থেকে আসবে সে টাকা? কে দেবে? এদিকে যে দিন চলে না। পারল না ভিখারীর মা।

সর্বস্ব বলি দিয়েও সমস্ত জমিকে বাঁচাতে পারল না সে। তিন চার মাস কেটে গেলে তালুকদার মোকদ্দমা করবে বলে ভয় দেখাল, প্রস্তাব করল যে হাঙ্গামা এড়াতে হলে তিন বিঘে জমি বেচে ফেলুক ভিখারীর মা। ষাট টাকা করে প্রতি বিঘার দাম দেবে সে। দেনা শোধ করেও কিছু টাকা হাতে থাকবে ভিখারীর মার।

অন্যান্য ধনী গৃহস্থদের কাছে গেল ভিখারীর মা—যদি কেউ আরো বেশি দামে জমি কেনে। কিন্তু সুরেন তালুকদার যে জমি নিতে চায় তা বেশি দামে নেবার সাহস আর কারো হল না। গেল, শেষ পর্যন্ত তিন বিঘে মাখনের মত জমিকে বেচতে হল তালুকদারের কাছে। তালুকদার ভিখারীর মার ইজ্জৎ নিল, আবার দেহের একটা টুকরোও যেন কেটে নিল। টাকা শোধ করে বাড়ি ফিরে শক্ত মাটিতে মাথা খুঁড়ে রক্ত বের করল ভিখারীর মা। ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে কেঁদে খুন হল। তিন বিঘে জমি গেল, বাকি রইল দু'বিঘে পাঁচ কাঠা।

সেদিন থেকে অবস্থাটা দ্রুত পালটাতে লাগল। গৃহস্থের বৌ, তরিতরকারি নিয়ে হাটে যেতে পারে না, অন্য কাজ করতে পারে না। এত বড় পৃথিবীতে বসিয়ে বসিয়ে ভাত খাওয়াবার মত কোনো পরমাত্মীয়কেও দেখা গেল না। গাঁয়ের কেউ এগিয়েও এল না সহানুভূতি জানাতে। একা, সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ল ভিখারীর মা। জীবনকে দলে পিষে ধ্বংস করার জন্য যে সব অদৃশ্য শক্তিরা চক্রান্ত করছিল তাদের সঙ্গে সে একাই লড়াই করতে লাগল। কিন্তু কতদিন—কতদিন? দুর্দিনের অন্ধকার আরো জাঁকিয়ে এবার আকাল হয়ে এল, জানোয়ারের মত মানুষদের ঘাস-পাতা খেয়ে বাঁচবার কথা শোনা গেল। এল ব্যাধি, এল নগ্নতার লজ্জা। দু'বছরের খাজনা বাকি পড়ল। আবার দেনা করতে হল। এর বাড়িতে ওর বাড়িতে ঢেঁকি কুটে, ধান ঝেড়ে, মুড়ি ভেজে আর কতটুকু সামান্য দেওয়া যায় এই দুর্দিনে, যখন চড়া দামে সব কিছু আগুনের মত হয়ে উঠেছে?

এবার টাকা দিল লোচন ঘোষ। একবার নয়, চারবার। লোচন ঘোষ হুঁশিয়ার-লোক, প্রতিবার টিপসইযুক্ত হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিল সে। একটু একটু করে জমি বন্ধক দিয়ে টাকা নিল ভিখারীর মা। শেষে সমস্ত জমিই বন্ধকি হয়ে দাঁড়াল, আর দেনা হল মোট একশ' পঁয়ষট্টি টাকা—চক্রবৃদ্ধি হারে

সুদ ধরে। লোচন ঘোষ সুরেন তালুকদারের মত খারাপ লোক নয়। ছ'মাস সময় দিল সে। দেখতে দেখতে তা কেটে গেল। লোচন ঘোষ এক কথার মানুষ, আর সময় দিল না। এবার জমির দর উঠল দেড়শ' টাকা বিঘে, কিন্তু উপায় নেই, জমি তো বন্ধকি। লোচন ঘোষের পায়ে পড়ল ভিখারীর মা, বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদল। ফল হল না। নিষ্ঠুর, নির্বিকার না হলে কি কেউ জোতজমি করতে পারে? অতএব? রঙ্গমঞ্চের শেষ দৃশ্য ঘনিয়ে এল—সে দৃশ্যের স্থান সাব-রেজিস্ট্রারের দপ্তরখানা।

"গঙ্গাকুমারী বর্মণ হাজির হো-ও-ও-ও"—পিয়াদার ডাক ভেসে এল। চম্‌কে উঠল ভিখারীর মা। যেন প্রেতলোক থেকে ডাক এল, যেন ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্য জল্লাদের হাঁক শোনা গেল।

লোচন ঘোষ লাফিয়ে উঠল, "চল্ চল্ ভিখারীর মা শিগ্‌গির, উঠ্‌রে মহাদেব উঠ্‌"—

ভিখারীর মার মুখে তেলতেলে ঘাম। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলে যেমন বিহ্বল চোখে তাকায় মানুষেরা তেমনি ভাবে চারদিকে তাকাল সে, কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।

কাঠগড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

রোগা, পাতলা, বুড়ো হাকিম নথিপত্তরের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন। মুখে ক্লান্তি ও বিরক্তি, চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা। একবার মুখ তুলে তাকালেন তনি, ভিখারীর মাকে এক ঝলক দেখেই আবার কাগজপত্তরের গাদায় দৃষ্টিটা নিবদ্ধ করলেন।

পিয়াদা ডাকল, "গঙ্গাকুমারী বর্মণ কৈ?"

লোচন ঘোষ বলল, "হাজির আছে"—

"কে?"

লোচন ঘোষ ভিখারীর মাকে দেখাল—"এই যে।"

পিয়াদা হাকিমের হয়ে মুখস্থ করা প্রশ্ন করল, "তুমিই গঙ্গাকুমারী বর্মণ?"—

ভিখারীর মা ঘাড় নাড়ল, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ"—

"তোমার স্বামীর নাম নিতাই বর্মণ? গোমস্তাপুর থানার মেহেরপুর গাঁয়ে বাড়ি?"

"হুঁ।"

"তুমি জমি বেচবে?"—

"হুঁ"—

"তোমাকে সনাক্ত করবে কে?"

মহাদেব এগিয়ে গেল, সহাস্যে বলল, "আজ্ঞা হামি, মহাদেব দাস"—

"হুঁ, তোমার বাপের নাম?"

"আজ্ঞা কানাই দাস।"

"তুমি গঙ্গাকুমারী বর্মণকে চেন?"

"আজ্ঞা হুঁ"—

ভিখারীর মার দিকে ফিরে তাকাল পিয়াদা, জিজ্ঞেস করল, "সব টাকা পেয়েছ, জমির দাম?"

লোচন ঘোষ কোমর থেকে ন্যাকড়ায় বাঁধা টাকা বের করে ভিখারীর মার হাতে দিল, বলল, "এই যে দিলাম"—

পিয়াদা বলল, "আচ্ছা এবার যাও।"

নরহরি এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে, ডেকে নিয়ে গেল কেরানীবাবুর কাছে।

একটা মোটা খাতায় টিপসই দিল ভিখারীর মা। বলির পশুর মত কাঁপতে কাঁপতে ভয়ার্ত চোখের দৃষ্টি মেলে, মাংসহীন লিক্‌লিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

ঘরের ভেতর তখন দেয়াল ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করছে। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, পিয়াদার মুখস্থ করা প্রশ্ন ধ্বনিত হচ্ছে। পেশ্‌কারের তাড়া খেয়ে মুসলমান পাখাওয়ালাটা হঠাৎ সক্রোশে দড়ি ধরে টানছে। ডাইনীর ডানার মত বাতাসকে আঘাত করছে পাখাটা, শাঁশাঁ শব্দ হচ্ছে। আর চশমা পরিহিত হাকিম সাহেব ঝুঁকে আছেন তার টেবিলের ওপর, নির্বিকার ব্রহ্মের মত।

সব শেষ। যবনিকা পতন। করাত দিয়ে কে যেন ভিখারীর মার গলাটা কেটে ফেলেছে। বাইরে বেরোল ওরা।

লোচন ঘোষ বলল, "টাকাটা গুনা দ্যাখ্‌ ভিখারীর মা"—

ভিখারীর মা গুনল—যন্ত্রের মত। মহাদেবও গুনল।

"কত আছে?"

"পঞ্চান্ন টাকা বারো আনা"—মহাদেব বলল।

"ঠিক"—লোচন ঘোষ মাথা ঝাঁকালো, "তবে হিসেব শোন্। একশো পাঁয়ষট্টি টাকার দেনা, তুদের গাড়িভাড়া বারো আনা, চিড়ের দাম চার আনা, আর দু'বছরের বাকি খাজনা তিন টাকা ছ'আনা—কত হইল? একশো উনসত্তর টাকা ছ'আনা কেমন? বেশ। এখন দু'বিঘে পাঁচ কাঠা মাটির দাম হইল গিয়া দু'শো পঁচিশ টাকা—আমার পাওনা বাদ দিয়া তাই ঐ টাকা দিলাম। আমি খারাপ লোক লই ভিখারীর মা। কোর্টের কাগজের দাম কোর্ট-ফি আর নরহরির টাকাটা আমিই দিলাম, যা কথা ছিল তা রাখলাম। লাও হে নরহরি, এই টাকাটা লাও"—

নরহরি দাস খুব খুশি হল না, "মাত্র এক টাকা! কি যে বলেন ঘোষ মশাই!"

"আরে লাও লাও, আবার এমনি কতবার আসব দেখো, লাও"—নিঃশব্দে তাই নিল নরহরি। লোচন ঘোষের কথা যে মিথ্যে নয় তা সে জানে।

লোচন ঘোষ বলল, "আচ্ছা আমি তবে যাই, একটু কাজ আছে। তুরা স্টেশনে যা—আমি আসছি—আর ভিখারীর মা চারডা খায়া লিস্।"

ভিখারীর মা কথা বলল না। লোচন ঘোষ পা বাড়াল, মহাদেব বলল, "একটা বিড়ি দিয়া যান্ মাহাজন, এই শ্যাষবার।"

লোচন ঘোষ গাল দিল, "ব্যাটার কি একটুও লজ্জা থাকৃতে নাইরে বাবা আঁ? লে, লে হতভাগা, খায়া মর্"—

একটা বিড়ি দিয়ে দ্রুতপদে চলে গেল লোচন ঘোষ। খুব বেশি চটল না এবার। জমি পেয়ে মনটা খুশি হয়ে গেছে তার। মাখনের মত নরম জমি, সোনার মত ধান ফলে তাতে। খুব সস্তাতেই তা পেয়ে গেল সে—শুধু তাই নয়, জমির ওপর যে ধান ফলেছে এবার তাও সে ভোগ করতে পারবে। সুতরাং সে খুশি হবে না কেন?

*　　　　*　　　　*

মহাদেব বলল, "চল্ ভিখারীর মা—চাট্টি খায়া লে, শরীর পাত করিস্ না"—

ভিখারীর মা নিরুত্তরে হাঁটতে লাগল—খোঁড়া কুকুরের মত, মুমূর্ষুর মত, যন্ত্রের মত।

"ভাত খাবু ভিখারীর মা—ভাত? জমি বিচ্‌লি, অ্যাখন তো পাইসা আছে সাথে"—মহাদেব বলল।

পশ্চিমা বামুনের টিনের ঘর। তার গায়ে আল্‌কাৎরা দিয়ে লেখা আছে—'বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল—আসুন'।

ভাত। নড়ে উঠল ভিখারীর মা। ভাত। কাল থেকে আজ পর্যন্ত পেটে ভাত যায়নি। যা ছিল তা সব ছেলেমেয়েদের জন্য রেখে এসেছে সে।

"খাবু?" মহাদেব প্রশ্ন করল নরম গলায়।

"তুমি খাবা না?" ভিখারীর মা শুক্‌নো গলায় পাল্‌টা প্রশ্ন করল।

"হামি তো চিড়া খাইয়াছি"—মহাদেব দুর্বলকণ্ঠে বলল। এমন ভঙ্গিতে বলল যার অর্থ এই যে খেলে মন্দ হয় না।

"না না, তুমিও খাও দুডা—হামার জন্য কত দুঃখ পালা"—টেনে টেনে বলল ভিখারীর মা।

ভেতরে গেল ওরা। পশ্চিমা বামুন কলরব করে অভ্যর্থনা জানাল। মোটা চালের ভাত, আলুভাজা আর অড়হর ডাল এনে দিল।

বাইরে তখন বেলা পড়ে এসেছে। দুপুর অতিক্রান্ত, শান্ত প্রকৃতি। কিন্তু ভিখারীর মার কাছে পৃথিবীর সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ তখন অর্থহীন।

খুশিমনে ভাতে হাত দিল মহাদেব। চিড়ে আর ভাত, কাঁচা আর পাকা ফলার—দুই-ই জুটল তার। আর বাড়ি থেকে নিয়ে আসা চার আনা পয়সাও অটুট আছে। আঃ!

কিন্তু ভিখারীর মা খাচ্ছে না। চুপ করে ভাবছে। কোমরে পঞ্চান্ন টাকা বারো আনা ঠিকই আছে। কিন্তু তাতে কি হবে? ক'দিন চলবে? গৃহস্থের বৌ, হাটে যেতে পারেনি, কুলিমেয়েদের মত খাটতে পারেনি। কিন্তু এই টাকা ফুরোলে কি হবে? ভিখারী, ন্যাড়া, কাদু—ওদের তো বাঁচাতেই হবে। না, উপায় নেই। অনেকদিন আগেই তো ইজ্জৎ গেছে, এবার হাটে গেলেই বা কি, মজুরনী হলেই বা কি? তাছাড়া আর উপায়ও নেই। আরো নিচে নামতে হবে। তবু হার মানবে না ভিখারীর মা—ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখবেই সে। কিন্তু মরা মানুষ কি করে সন্তানদের বাঁচাবে। মরা না তো কি। ভিখারীর মা তো মরে গেল আজ। কারণ, জমিই ছিল তার প্রাণ। সেই জমি আজ থেকে আর তার নয়। কে যেন একটা অদৃশ্য করাত দিয়ে

ভিখারীর মার গলা কেটে ফেলেছে। জ্বলে যাচ্ছে বুক, চোখ; কানের ভেতর ঝিঁঝিঁ ডাকছে, মাথায় রক্ত চড়ছে, সব কিছু অন্ধকার হয়ে আসছে।

এতদিন ছিল, আজ আর তার জমি নেই। সপ্তরথীর মত সাতটা তালগাছ যেখানে মাথা তুলে আছে সেখানেই সেই জমি। শরতের আকাশের নিচে বিস্তৃত হয়ে আছে সতেজ সবুজ বরণের চারাগুলো, তার ওপর হাওয়ায় দুলছে, নিশ্বাস ফেলছে। তাদের মাঝে চড়ুই, শালিক, ময়নারা কিচির-মিচির করে উড়ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিন কাটবে, সে ধান পেকে সোনা হবে। এমনি বছরের পর বছর কাটবে। অকৃপণ স্নেহের ভাণ্ডার খুলে সেই মায়ের মত মমতাময়ী মাটি চিরকাল প্রাণের পসরা মেলে ধরবে। কিন্তু তাতে ভিখারীর মার কোন লাভ নেই। জমি তো এখন লোচন ঘোষের। কিন্তু কোনদিন যদি সে নির্জন মুহূর্তে, সন্ধ্যার অন্ধকারে ওখানে গিয়ে দাঁড়ায়। তাহলে—সেই ক'বিঘে মাটি কি তাকে চিনবে না, সম্ভাষণ জানাবে না?

মহাদেব খাওয়া থামাল, অবাক হয়ে বলল, "খাচ্ছিস্ না যে—খা ভিখারীর মা"—

ভিখারীর মা মাথা নাড়ল, ভাতে হাত দিয়ে এক গ্রাস মুখে তুলল, চিবোতে আরম্ভ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিষম খেল সে, তার মুখের ভাত ছিট্‌কে পড়ল সামনে, থু থু করে ফেলে দিল সে বাকি ভাত, ফেলে কাঁদতে লাগল।

"কি হইল তুর ভিখারীর মা—আঁ্যা?" মহাদেব রীতিমত ঘাব্‌ড়ে গেল।

হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল ভিখারীর মা, হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বাঁধানো মেঝের ওপর মাথা ঠুকতে লাগল, পশুর মত আর্তকণ্ঠে বলল, "হামার খুন খাছি গো হামি—হামার খুন"—

সখা

সুশীল জানা

"লগর মাঝির সঙ্গে তোমার সাদি হবে।" বন্‌শী সকৌতুকে ব'ললে, "তবে যে তুমি হলে মোর সয়া। লগর যে মোর সাঙাৎ ছিল।"

মংলা কেমন অন্যমনে বললে, "সে কথার পর চার-পাঁচ বচ্ছর কেটে গেল।"

"লগর এখন কোথায়?"

"সে তো চলে গেল কয়লার খাদে।" মরা গলায় আস্তে আস্তে বলে মংলা, "হঠাৎ একদিন চলে গেল খেপে।"

"তারপর?"

"তারপর চার-পাঁচ বচ্ছর কেটে গেছে।"

"মন খারাপ কোরোনি হে সয়া—সে আসবে।" বন্‌শী লগর মাঝির কথা বলে, "ছোট যখন ছিলাম—মহিষের পাল লিয়ে চরাতে আসতাম জংগলের ধারে ডাহীতে, সে-ও আসত। মোরা লাচতাম, গাইতাম, বাঁশি বাজাতাম, শালবনে ফুল পাড়তাম মহুয়ার। সে সব দিন মনে পড়ে যাচ্ছে হে সয়া।"

মংলা কিন্তু আর কোনো কথা ব'ললো না। চুপ ক'রে রইলো দূরের দিগন্তছোঁয়া প্রান্তরের দিকে চেয়ে। তার উজ্জ্বল কালো চোখে এই শূন্য পোড়া প্রান্তরের শূন্যতা প্রতিবিম্বিত হয় বুঝি কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললো, "সে দিন উড়ে পুড়ে গেছে। জংগল লিয়েছে জমিদার, গোচর ডাহী লিয়েছে কাগজের কল, জমিন গেছে, গো-মহিষ গেছে, সুখ গেছে—শান্তি গেছে হে বিদেশী। আমি এখন কাগজ কলের ঘাস কেটে মরি—আর তুমি কি না গাঁ ছেড়ে আজ লুকিয়ে আছ মোর ঘরে।"

"হাঁ—আছি। কিন্তু চিরদিন কি লুকিয়ে থাকব সয়া? আবার ঘুরে আসবে সেদিন।"

"কি জানি বিদেশী।"—

"মোকে তুমি এখনো বিদেশী বলেই ডাকবে সয়া ?"

মংলা হেসে ব'ললে, "তুমিতো তাই বলেছিলে একদিন মাঝি।"

"আজ তো একটা সম্পর্ক বেরিয়ে পড়লো সয়া।"

হঠাৎ একটা বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগে মংলার মুখটায়। তবু মুখে একটু হাসি টেনে এনে ব'ললো—"যাই, গরম জল আনি, তোমার ঘা ধুয়ে দিতে হবে।"

ঘুরে এল খানিক বাদে মংলা গরম জল নিয়ে—পায়ের ঘা ধুতে বসলো বন্‌শীর।

বন্‌শী নিজের ঘায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে বললো, "শালাদের গুলিটা ভাগ্যে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। না হলে পচে মরতে হত তোমার ঘরে সয়া।"

মংলা কোনো কথা ব'ললো না—মুখ নীচু করে এক মনে জলের ছিটে দিয়ে ঘা ধুতে লাগল।

বন্‌শী ফের বললে, "সেরে এসেছে—না কি বল ?"

মংলা অন্য মনে শুধু বললে, "হুঁ।"

হঠাৎ বন্‌শী মুখ খিঁচিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "আস্তে আস্তে—আস্তে হে সয়া।"

মংলা বোধহয় নিঃশব্দে একটু ফিক করে হেসে ফেলেছিল। বন্‌শী বললে, "হাসলে যে।"—

"এমনি", মংলা মুখটা আরও গোঁজ করে ঘা ধুতে লাগল।

"এমনি হাসলে ?"

মংলা আর কোনো কথা বললে না। এমনি সে হাসেনি ঠিক—ভাবছিল, এই লোকটাকে প্রথম যেদিন সে আবিষ্কার করলো তার জ্বালানির মাচার মধ্যে—সেদিনকের কথা। ঠ্যাংটা দেখা যাচ্ছিল শুধু—আর এক জায়গা থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছিল মাটিতে। মনে হবে বুঝি—ওই রকম একটা ঠ্যাং কে যেন জ্বালানির মধ্যে কেটে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

চমকে উঠেছিল—ঠিক ভয় পায়নি মংলা, নিঃশব্দে ঘুরে গিয়ে চাল থেকে টাঙিটা নামিয়ে ফিরে এসে বলেছিল, "কে ঢুকেছিস বটে—বেরিয়ে আয়, না হলে দিলাম ঠ্যাং কেটে।"

প্রথমে ঠ্যাংটা নড়েও না চড়েও না।

"তবে দিলাম টাঙির কোপ।" মংলা ধমকেছিল। একটা জোয়ান

মরদ বেরিয়ে এল তারপর—তার জাতের মানুষ, শুধু মাথায় নেই যা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বেরিয়ে এল ঠ্যাং ঘষটে ঘষটে। তারও হাতে টাঙি।

"কে তুই বটে।" মংলা রুখে দাঁড়িয়েছিল।

"চিনবেনি মোকে, আমি বিদেশী।"

"বিদেশী! কুঁন গায়ের লোক বটে হে!"

লোকটা মংলার কুঁড়ের পেছনের জংগলটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল, "জংগলের ওপার—গিরধিনি।"

"তো মোর মাচার মধ্যে ঢুকলি ক্যানে?"

লোকটা অক্লেশে বললে, "রাতটা থাকতাম।"

"আর দিন এখনও শেষ হয়নি! ঢুকেচিস মোর মাচার মধ্যে।" মংলা বাজে কথায় ভুলবার মেয়ে নয়! বাপ মরে যাওয়ার পর একাই সে ঘর করছে। উনিশ কুড়ি বছরের গাঁট্টা-গোট্টা জোয়ান সাঁওতাল মেয়ে। ধমকে বলেছিল, "কে তুই বল ঠিক্ ঠিক্।"

"বিদেশীর নাম জেনে কি হবে। রাতটুকুন্ তো শুধু মাথা গুঁজে থাকতাম"—

"মোর মাচার মধ্যে ঢুকলি আর নাম বলবিনি। গিরধিনির লোকত ইদিকে এসেছিস ক্যানে।"

"এই—কাঠ কাটতে।"

"হুঁ!—তোদের জমিদার জংগল কেড়ে লেয়নি?"

"লিয়েছে। তাইত বেরিয়ে পড়েছি।"

"তো মোদেরও তো লিয়েছে।"

"তবে চাষের জমিন পাই যদি—"

"জমিন! হোই দ্যাখগা—বাবুই ঘাস। কাগজ কলের মালিক গোচর ডাহী আর ধানী জমি সব কেড়ে লিয়ে ঘাসের চাষ করেছে।"

"মোদেরও তাই।"

"তবে! সব জেনে শুনে ন্যাকামি করছিস্ ক্যানে তবে?"

এত জেরাতেও এতটুকু ঘাবড়াচ্ছে না লোকটা। তার এন্তার মিছে কথা যে বুঝতে পারছিল না মংলা তা নয়। তবে মনে মনে নিজেও সে বিব্রত হয়ে পড়ছিল—কি করবে সে এ লোকটাকে নিয়ে।

লোকটা আরও বললে, "আজ রাতটা মোকে থাকতে দিলে ভোর-ভোর আমি চলে যাব। পায়ে বরায় দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, বড় ব্যথা হচ্ছে।"

"হুঁ। কুথায় ছিল বরা?"

"বনে।"

"বনে। সত্যি কথা বল—কুথায় দেখেছি যেন তোকে। ঠিক দেখেছি মনে হচ্ছে।" মংলা পাকড়াও করেছিল শেষ পর্যন্ত।

লোকটা হেসে বলেছিল, "কুথায় দেখবে আবার মোকে! আমি বিদেশী। তোমার দাওয়ায় পড়ে থাকতে দাও শুধু রাতটা—ভোর-ভোর যেখানে হোক চলে যাব। আমি তোমার জাতের লোক—দুঃখী লোক। মোকে অবিশ্বাস কোরোনি। ভয় কোরোনি।"

"আরে দূর! তোকে আবার ভয়।" ঠোঁট বেঁকিয়ে মংলা বলেছিল, "তবে থাক গে যা—হোই চ্যাটাই পাতা আছে দাওয়ায়।"

"চ্যাটাই-মেটাই মোর দরকার নাই।—হোই জ্বালানীর মাচাং-এ থেকে যাব।"

"হুঁ। লুকাতে চাস? তুই ঠিক চোরাই হাঁড়িয়া চোলাই করতিস, আর পুলিস তাই তোকে তাড়া করেছে।"

"তাই যদি হয়। জেতের লোককে পুলিসে ধরিয়ে দিবি?"

নাঃ—লোকটা অসম্ভব!—তাকে আপাদমস্তক একবার যাচাই করে দেখেছিল মংলা চোখ কুঁচকে। তারপর বলেছিল—"নাঃ, পুলিস বড় হারাম। মোদের বন্‌শী মাঝিকে ধরবে বলে তল্লাট ঢুঁড়ে ফেলেছে।"

"বন্‌শী মাঝিটা আবার কে হে।"

"দূর ভূত কোথাকার। তার নামও শুনিস নাই?" মংলা অবাক হয়ে বলেছিল, "সে বড় ভালো চ্যাংড়া হে।"

"তবে ভালো। আমি বিদেশী—মোর অত কথায় কাজ কি!"

"কাজ কি।" মংলা রুখে বলেছিল, "এই যে মোদের বন কেড়ে লিলে ডাহী জমিন সব কেড়ে লিলে, মোদের মরদ গুলান বিদেশে পালালো—তু ঘুরোৎ চাস না?"

"চাই তো। কিন্তু দেয় কে।"

"বন্শী মাঝি বলে—সব আবার ঘুরোৎ হবে। মোরা লড়াই করে কেড়ে লেব।"

"তো লে কেড়ে।" লোকটি বলেছিল গা ছেড়ে, "আমি কী না বলেছি ?"

তার এই গা ছাড়া জবাবে মংলা আবার গাল্ দিয়েছিল, "বিদেশী ভূত।"

রাতের বেলা সেই বিদেশী ভূতটাকে বাইরের ঘুপটি দাওয়ায় একটা চ্যাটাই পেতে শুতে দিয়েছিল মংলা। নিজে শুয়েছিল কুঁড়ের ভেতরে বাঁশের দরোজায় ভালো করে খিল এঁটে। কে জানে, বিদেশী শয়তানটার মনে কি আছে!

হঠাৎ ঘোর রাত্তির বেলা বন্ধ দরোজায় ঘা। আর চাপা গলায় ডাক :

"আহে—আহে—আহে"—

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় লেগেছিল বৈকি মংলার—কে জানে কি মতলবে ডাকছে লোকটা। দম বন্ধ করে বলেছিল—"শয়তানির মতলব থাকলে কেটে ফেলাব একেবারে।"

লোকটা ককিয়ে বলেছিল—"না গো—একটু জল দিতে পারো ? ছাতি ফেটে যাচ্ছে।"

হাতে টাঙি নিয়ে দরজা খুলেছিল মংলা। দেখে—লোকটা হুঁ-হুঁ করছে। জিজ্ঞেস করেছিল, "কি হল তোর।"

"জ্বর। বড় তেষ্টা। আর মোর জখম পা-টা যেন খসে যাচ্ছে হে।"

দেখতে দেখতে পা-টা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। অতএব ভোর-ভোর য-বিদেশীর চলে যাওয়ার কথা, তা আর হালো না। অধিকন্তু লোকটার ফাই-ফরমাস খাটতে হল মংলাকে। সেদিন ঘাস কাটতে যাওয়া হলো না তার। লোকটা বললে, "যাবে একবার পিয়ারডোবা গাঁয়ে—মোর কুটুম আছে, গুরাই মাঝি। তাকে বলবে যেয়ে শুধু—তোর মামাত ভাইয়ের সুখ। দেখবে—ই খবর আর কারুকে দিবেনি কিন্তুক।"

কি করে মংলা আর—যেতে হলো। বিদেশী লোক বিপদে পড়ে গেছে। লোকটার কি রহস্য আছে কে জানে ; তবে আছেই কিছু!

খবর দেওয়ার পর গুরাই মাঝি আর একটি ছোকরা এলো রাতের আঁধারে ঘুপটি মেরে। দেখে মংলা তো আগুন। বললে, "কি রকম লোক

বটে হে তোমরা। খবর দিলাম সকালে—এলে রাতের বেলা। ইদিকে কাহিল হয়ে পড়েছে তোমাদের রুগী।"

বিদেশী বললে, "চেঁচাও নি হে।"—

মংলা গর্ গর্ করতে করতে চলে গিয়েছিল। তারপর ফিস্-ফাস্ গুজ-গাজ কথা ওদের হলো অনেকক্ষণ ধরে। খানিক বাদে চলে গেল দুজন—রুগী রইল পড়ে যেমন যেখানে ছিল। লোক দুজন চলে যেতেই ছুটে এসেছিল বিদেশীর সামনে মংলা—রাগে নয়, শ্রদ্ধায়—আনন্দে, মর্মজ্বালায় জ্বলে।

"এতক্ষণ বলোনি কেন মোকে—বলোনি কেন। যদি বিপদ হত।"

"কি বলবো হে?"

"তুমি বন্‌শী মাঝি!"

"কে বললে?"

"এই যে আমি আড়ি পেতে শুনলাম।"

এবার বিদেশী চুপ।

"সারাদিন তোমাকে আমি দাওয়ায় ফেলে রাখলাম!" অনুশোচনায় এবার যেন কান্না পেয়েছিল মংলার। বললে, "চলো ঘরের ভেতরে।" ঘরের ভেতরে শোয়ার জায়গা করে দিয়ে বন্‌শীকে শুইয়ে দিল মংলা। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে—কি যেন ভাবল একটু। বললো আস্তে আস্তে "মোকে ক্ষ্যামা কর।"

বন্‌শী কাৎরে বললে, "এদিকে পা-টা মোর খসে গেল!"

মংলা আবার বললে, "কাল থেকে মোর ঘরে তোমার অনেক কষ্ট গেছে।"

"ও সব কিছু না হে।"

"দেখি তোমার পা?" মংলা এতক্ষণে পায়ের ঘা-টা দেখতে দেখতে বললে, "বন্দুকের গুলি লেগেছিল কাল।"

"কি করে জানলে হে?"

"শুনেছি। সবাই জানে। বন্‌শী মাঝিকে কাল জংগল ঘেরাও করে পুলিস ধরতে গেছল—পারেনি। কোথায় নাকি পালিয়ে গেছে।" মংলা আবিষ্ট ভাবে বললে, "কিন্তু সে যে মোর ঘরে।"—

"ঘোর কথা কারুকে আর বলোনি তো।"

"না। আমি ভাবলাম, হোক বিদেশী—জেতের লোক ত। লোকে জানলে হয়তো কোন বিপদ আপদ হয়ে যেতে পারে। থাকবে তো একটা রাত মোটে—তো থাক। তাই বলিনি।"

"খুব বুদ্ধি তোমার হে।"

"আমি যাই এখন—রেতের বেলা ঘায়ের পাতা খুঁজে পাই কোথায় দেখি আবার।"

"রাতে থাক না "

"উঁ হুঁ—খারাপ হতে পারে, ঘায়ের ভেতরে রস ঢুকিয়ে দিয়ে ওপরে পাতা বসিয়ে দিলে ভেতরে যদি কিছু থাকে ত সব ঠেলে বেরিয়ে আসবে। ফুলা কমে যাবে, দরদ থাকবেনি। আমি যাই।"—

সেই বিদেশী—বন্‌শী মাঝি। দ্বিতীয় দিনে রাতে শোবার ব্যবস্থা উল্টে গেল। বন্‌শীকে ঘরে দিয়ে দরজা আগলে শুলো মংলা, পাশে টাঙি। শুলো বটে—ঘুম হল না সারা রাত। বাইরের প্রতিটি শব্দে চমকে উঠতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে।

বন্‌শী বলেছিল একবার, "বাইরে শুলে যে তুমি।"

"হাঁ, কেউ এলে রইলাম আমি। তুমি ততোক্ষণে ঘরের দেয়াল ভেঙে চলে যেতে পারবে বনের দিকে।"...

বনশী মাঝির এত কাণ্ডে হাসবে না মংলা। ঘা এখন সেরে আসছে—আর কদিন বাদে দিব্যি চলে বেড়াতে পারবে। খোঁড়া হয়ে যাওয়ার বিপদ কেটে গেছে। প্রথম দিনেই পাতা বেঁধে দিলে এত কাণ্ড হত না।—ঘা পচে বিষিয়ে উঠতো না। কিন্তু প্রথম দিন লোকটা মাচা থেকে ঘষটে ঘষটে বার হয়ে এসে বললে কিনা, 'বিদেশী।'—

ঘা ধুয়ে নতুন করে তাতে কী একটা বুনো পাতা বসিয়ে দিয়ে উঠলো মংলা। বললে, "পা এবার সেরে উঠেছে মাঝি—কিন্তু খবরদার বাইরে বরিয়োনি।"

কৌতুক করে বন্‌শী বললে, "কোথায় যাব আর সয়া, অমন শুইয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কে। মংলার ই ঘরের কোণ ছেড়ে কোথাও যেতে আর মন নাই মোর।"

"মনে রইলো মাঝি"—বলে নিজের একটা আবেগ চাপবার জন্যে তাড়াতাড়ি উছলানো মুখটাকে ঘুরিয়ে নিল মংলা অন্যদিকে। আস্তে আস্তে বললে, "এবার যাই আমি ঘাস কাটতে, দেরি হলে পয়সা কাটবে চোর গুলান।"

দিনের শেষে মংলা সেদিন যখন ঘুরে এল তখন খোঁপায় তার কৃষ্ণচূড়ার এক থোকা ফুল গোঁজা। এসে দাঁড়ালো বন্‌শীর সামনে—সারা দিনের ক্লান্ত মুখটাও যেন মিষ্টি হাসিতে ভরে আছে। শুধোলে, "বাইরে বেরোয়নি ত বিদেশী ?"

কৌতুক করে বনশী বললে, "হ্যাঁ—ঘুরে এলাম তোমাদের গাঁয়ের বসৃতি।"

মুহূর্তে পাংশু হয়ে উঠল মংলার মুখ।

বন্‌শী হাসলো।

মংলা বললে, "তুমি ত জান না মাঝি, তোমাকে ধরার জন্যে দু'কুড়ি দশ টাকা দেবে বলে সরকার ঢোল দিয়েছে। যদি কেউ—" মংলা ভয়ে থেমে গেল।

বন্‌শী বললে, "বলো কি গো সয়া। তবে তুমি খপর দিয়ে এসো সরকারকে, তারপর ওই দু'কুড়ি দশ টাকা নিয়ে চলে যাও সাঙাতের কাছে রেল গাড়িতে চেপে।'

"ই কথা তুমি বললে মাঝি" মংলা ভারি চোখ তুলে তাকালো এক দৃষ্টে বন্‌শীর দিকে।

বন্‌শী হেসে উঠলো। বললো,—"আচ্ছা মোর কথা নয় ঘুরোৎ দাও। যেওনি তুমি। কিন্তু সয়া, মাথায় ফুল দিয়েছ। মুখ-চোখ যেন কেমন ধারা। আজ ঠিক মোর স্যাঙাতের কথা মনে পড়েছে তোমার।"

মুখ-চোখ ভারি হয়ে উঠলো মংলার—বন্‌শীর সামনে যেন দাঁড়াতে আর সে পারছিল না। যাওয়ার সময় বলে গেল শুধু, "সে মোর কাছে মরে গেছে।"

ডেকে আর হালকা কথা বলতে সাহস হলো না বন্‌শীর। মংলা বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারে। তারপর খোঁপার ফুলগুলো টেনে কি ভেবে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সহসা কেন তার মনে হলো—ফুলের তার আর দরকার নেই।

দাঁড়িয়েছিল সে এক ভাবে, এমন সময় সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল এক সাঁওতাল আধবুড়ো। বললে, "বলো বন্ মাঝিকে—পিয়াশাল থেকে এসেছি।"

মংলা বললে, "চলে যাও ঘরের ভিতরে।"

কিছুক্ষণ বাদে আবার একটি লোক বেরিয়ে এল বনের ভিতর থেকে ঘুপটি মেরে বললে, "শালবোনি থেকে এসেছি—বন্ মাঝিকে বলো।"

এমনি করে লোক এল আরও কয়েকজন। গোদা, শিয়াশাল, শালবোনি, পিয়ারডোবা, কালি পাথরি, চন্দ্রকোনা, জমায়েত হলো এসে একে একে। এমনি হয় এক-একদিন। বিরাট এক পাহাড়ী জংগলের কিনার ঘিরে আদিবাসী এলাকা—লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত, দরিদ্র। গর্ গর্ করছে আরণ্যক জীবন—আগুন জ্বলে ওঠার আগে গুমরে মরা ধোঁয়ার মত। সেই অসন্তুষ্ট ঘূর্ণাবেগ ধোঁয়ার তালে যেন ঘর ভরে যায় মংলার। সেদিন অনেক কী সব শলাপরামর্শ করে ওরা চলে গেল একে একে রাত যখন গভীর হলো।

মংলা এতক্ষণ বসেছিল দাওয়ার এক কোণে। এসব কথার মাঝখানে বন্‌শী মাঝি তাকে ডাকে না, বরং কথার ছলে যেন সরিয়ে দেয়। হয়তো কোন গোপন কথা হয়। রাগ হয়, অভিমান হয় মংলার—তারই ঘরে লুকিয়ে থেকে বন্‌শী মাঝি তাকে বিশ্বাস করে না!

সেদিন সবাই চলে যাবার পর মংলা উঠি উঠি করছিল ঘরের ভেতরে যাবে বলে—এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ধপ্ ধপ্ করে খোঁড়া পা টেনে স্বয়ং বন্‌শী মাঝিই এসে হাজির বাইরের দাওয়ায়।

"সয়া!"—

মংলা তাড়াতাড়ি তার সামনে ছুটে এসে দাঁড়ালো।

বন্‌শী মাঝি দু'টো হাত মুঠো করে ধরলু তার। ব'লে উঠলো—"তুমিই হলে মোর খাঁটি সয়া। মুখ ফুটে বলতে হয় না কিছু—প্রাণের কথা আপনি বুঝে লাও!"

"কি হলো মাঝি?" মংলা ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাকালো তার মুখের দিকে।

"কি হলো সয়া? এত কাণ্ড করছো তলায় তলায়—বলোনি ত মোকে একদিনও।"

"কি করলাম মাঝি।"

"এর মধ্যে একদিন চন্দ্রকোনা গেছলে ?"

"গেছলাম মাঝি।"

"সেখানে বলে এসেছ—ও গাঁয়ের তোমরাও যাবে জংগলে দখল নিতে?"

"হ্যাঁ মাঝি।"

"এর মধ্যে কবে ঘাস কাটার মজুরি বাড়ানোর জন্যে দু-দিন কাজ বন্ধ করেছিলে নাকি ?"

"করেছিলাম মাঝি।"

"সবাই তোমার কথা শোনে ?"

"কথাটা যে সকলের মাঝি।"

"এসব কথা নিয়ে মোর সঙ্গে তো শলা পরামর্শ করোনি কোনদিন।"

"তোমাদের শলা পরামর্শে মোকেও তো ডাকনি কোনদিন মাঝি।"

"মোর ঘাট হয়েছে সয়া। আর একটা কথা, আমি তোমার ঘরে আছি— এখানে তোমাদের সবাই কি তা জানে ?"

"তা জানে না।"

"কি বলেছ তাদের ?"

"বলেছি—ফেরার। বলেছি—লুকিয়ে আছে। আর বলেছি—চিরকাল কি সে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবে—দিনের আলোর মুখ কি দেখবে নি ?"

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইলো বনশী মাঝি। অন্ধকারেও যে উদ্দীপ্ত আবেগ ঢাকা পড়ে না সেই স্ফুরিত আবেগ কেঁপে উঠতে শুনলো তার গলায়, ঝলকে উঠতে দেখলো তার চোখে। এই মেয়েটা কোথায় কোন গাঁয়ে গাঁয়ে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়িয়েছে একা, গেছে চন্দ্রকোনার মাতব্বরদের কাছে লুকিয়ে, একজোট করেছে তাদের মেয়ে মরদকে অথচ কিছুই জানায়নি তাকে। মেয়েটাকে হঠাৎ মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে করে বনশীর।

বনশী মংলার কথার জের টেনে আস্তে আস্তে বললে, "ঠিক—অন্ধকার চিরদিন থাকবেনি সয়া—সবাই মোরা আলোর মুখ দেখবো।" তারপর হঠাৎ চোখ পড়লো বনশীর, মংলার খোঁপায় কৃষ্ণচূড়ার থোকাটা তো নেই। বনশী বলে উঠলো, "তোমার মাথার ফুল গেল কোথায় সয়া ?"

মেয়েটা কেঁপে উঠলো যেন সহসা। বললো, "ফেলে দিয়েছি।"

"কেন সয়া। বহুদিন পরে ফুল দিয়েছিলে—আমি এসে দেখিনি আর কোনদিন।"

মংলা কোন জবাব দিল না সে কথার। বন্‌শীর কোমরটা শক্ত করে ধরে বললে, "চল—ঘরে চল মাঝি। কাঁধে ভর দিয়ে চল মোর। লাঠি ছেড়ে হাঁটা তোমার উচিত হয় নি।"

বন্‌শী বললে, "সকলের মুখে তোমার কথা শুনে লাঠির কথা ভুলে গেলাম সয়া। মনে হলো—লাফ দিয়ে আজ ছুটে যেতে পারি।"

"চুপ করো মাঝি।"—

মংলার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বন্‌শী বললে, "না হে সয়া—কথা বলতে দাও। তোমার দিকে চেয়ে কথা বলতে দাও আজ। চুপ ত অনেক দিনই করেছিলাম—বাপ ঠাকুরদাদা পাথরের চাঙা কেটে কেটে ধানের জমি করেছিল—সেখানে মোরা আজ উটবন্দী চাষী। উঠ বললে যা চলে কোথায় যাবি। বনের লোক মোরা বনে ছিলাম। কাঠ কাটতাম—ফুল পাড়তাম মহুয়ার, খেতাম তাই বেচে। তাও কেড়ে কুড়ে ব্যবসা করছে খোট্টা জমিদার। গোচর ডাহীতে গোরু মোষ চরাতাম—তাও কেড়ে লিয়ে বাবুই ঘাসের চাষ করলো কাগজ কলের মালিক আর পাশে খুলে দিল গোরু ধরা খোঁয়াড়। গোরু ধরে ধরে সব নীলাম করে লিলে। চুপ করে ফৌত হয়ে গেল গরিব বাপ ঠাকুরদাদা। আর কত চুপ করে থাকবো বল সয়া?"—

জংগলের মানুষ কথা কয়ে উঠেছে। আশ্চর্য সেই দীপ্তিতে ঝকমক করে ওদের চোখ।

শাল মহুয়ার জংগল ঘেঁষে একটা মরা গাঁয়ের কোণ দেখে যেখানে একদিন গা ঢাকা দিতে এসেছিল বন্‌শী—দেখতে দেখতে সে জায়গাটা নতুন এক প্রাণস্পর্শে যেন নড়ে চড়ে উঠলো। অরণ্যের লুকানো আগুন ধুঁইয়ে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে নিঃশব্দ অসন্তোষের মাঝখানে।

তারপর সে আগুন জ্বলে উঠলো একদিন। কাজে বেরোবার আগে মংলা বন্‌শীর পায়ের ঘা ধুতে বসেছিল—এমন সময় একটি মেয়ে ছুটে এলো হাউ মাউ করে।

"মোদের গোরু চালান করে দিলে শয়তানরা গো দিদি—সব কটা গোরু।"

মংলা চকিতে মুখ তুলে তাকালো মেয়েটার দিকে।

"ঘাসে মুখ দেয় নাই—কিছু না।" মেয়েটি হাত কচলাতে কচলাতে অসহ্য গলায় বললে, "চরাতে যাচ্ছিলাম—জবরদস্তি ধরে খোঁয়াড়ে লিয়ে গেল হাসতে হাসতে।"

চোখে চোখে তাকাল মংলা আর বন্‌শী, নীরবেই বুঝলে ওরা—এ জবরদস্তির মানে কী। এ গাঁয়ের বস্তি উজাড় করে চলে গেল সব কটা গোরু। মোটা মুনাফা লুটবে ঘাস-ক্ষেতের খোট্টা মালিক; মুনাফা লুটবে সরকারী খোঁয়াড়, শুধু ভিটে মাটি চাটি হয়ে যাবে এ গাঁয়ের মানুষগুলোর। চালান হয়ে যাবে গোরুগুলো কোথায়।

তারপর সেগুলো শহর কারখানায় বিকোবে গোস্ত হয়ে।

মংলা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বন্‌শীর ঘায়ের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে, "ঘা প্রায় সেরেই এসেছে মাঝি—কিন্তু হাঁটার লোভে ঘরের বার হয়ে প'ড়ো না যেন। আমি যাচ্ছি—সাবধানে থাকবে। বেশি হাঁটা হাঁটি"—বলে বন্‌শীর স্তব্ধ শুকনো চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেল মেয়েটা। সেখানে নিঃশব্দ ভৎর্সনা। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল মংলা।

"মোদের মরদ গুলান কোথায় ?"

বাচ্চা সাঁওতাল মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাজে চলে গেল।"

"চল কোথায় দেখি।"

এদিকে বন্‌শী বসে রইলো কান পেতে। ওর চোখে চাপা ঔৎসুক্য। অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেল সে একটা হল্লা—গোলমাল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে এসে দাঁড়ালো বন্‌শী। দূর থেকে শুধু হল্লাটাই শোনা যায়—এখানকার নিঃশব্দ আকাশের শূন্যতা শিউরে উঠছে তাতে ক্ষণে ক্ষণে। আর কিছু বোঝবার উপায় নেই। বন্‌শী খোঁড়া পা টেনে টেনে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলো শুধু। এক সময় গোধূলি নামল অরণ্য প্রান্তে। বন্‌শী সাগ্রহে চোখ মেলে আছে ঘর-মুখো গোরু ভঁইসের ডাক শোনবার জন্য। কিন্তু চমকে উঠলো সে ধোঁয়ার তাল দেখে। সেগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশে—তারপর শোনা গেল হাওয়ায় গোরু মহিষের বুক ফাটা আর্তনাদ, আর মানুষের হল্লা। বাঁশ ফাটার শব্দ।...

এমন সময় মংলা এলো ছুটতে ছুটতে—সারা দিনের ক্লান্ত কঠিন মুখ ধূলি-ধূসর। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "শয়তান গুলান খোঁয়াড়ে আগুন লাগিয়ে দিলে মাঝি। মোরা সবাই গোরুর জন্যে ক্ষেতের কাজ বন্ধ করে বসে ছিলাম। ওরা আগুন লাগিয়ে দিলে।" ক্ষোভে, ব্যর্থতায় যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো ওর শুকনো চোখ থেকে।

বন্‌শী তাকিয়ে আছে নীরবে স্তব্ধ চোখে।

মংলা বললে, "এবার তুমি পালাও মাঝি। হারামিরা পুলিস ডাকবে। পালাও তুমি—না হলে ধরা পড়ে যাবে।"

"চলে যাবো বলছ ?"

"হাঁ আজই পালাও।"

"তাই ভালো। চলে যাই তবে জংগলের ওপার।"

"কিন্তু তোমার পা যে এখনও ভালো করে সারেনি মাঝি।"—

"ও ঠিক আছে সয়া। চলে যেতে পারব। ভাবছি শুধু, তোমাদের বনের ধারের মাত্‌লা নদীটা পার হবো কি করে। অথচ জংগলের ভেতর দিয়ে গেলেই ভালো হয়।"

মংলা বললে, "কলার মান্দাস করে দেব—ভেবোনি মাঝি।"

চললো পালাবার তোড়জোড়। সন্ধ্যের অন্ধকারে কলাগাছ কেটে ভেলা তৈরী করে লুকিয়ে রেখে এলো মংলা ঝাঁটি বনের ভেতরে। বন্‌শীর নির্দেশ মতো বাঁশের মোটা একটা লাঠি কেটে রাখলে। কয়েকজনকে পাহারায় রাখলে দূরে দূরে। বন্‌শীর সঙ্গে দেওয়ার জন্যে বাঁধলো ছোট ছোট গুটি দুই পুঁটলি। আজ সারা সন্ধ্যেটা কেবলি মনে হতে লাগলো তার—একটি লোক আজ চলে যাবে এতদিন যে ছিল তার ঘরে।

রাত যখন গভীর হলো তখন ডাকল্লো মংলা, "মাঝি।"

গলার স্বরটা বড় ভারি লাগে নিজেরই কানে। বন্‌শী মুখ তুলে তাকালো। মনে হল—মেয়েটা পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। অনেক কাজ করেছে হয়তো।

পুঁটলি দুটোর দিকে চেয়ে বন্‌শী বললে, "ই সব কি সয়া।"

"দুটো মুড়ি চিড়ে—আর ওটায় আছে গুড়, পাটালি নারকোল। রাস্তায় খাবে।"

"ই সব করেছ আবার।"

"বনেই যে দুদিন কেটে যাবে মাঝি।"

"তোমার দেওয়া শুধু এই লাঠিটা ধরে আমি হেঁটে যেতে পারতাম সারা বন।" বলে বন্‌শী লাঠিটা তুলে নিল।

মংলা পুঁটলি দুটো লাঠিতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো—তাকালো শুকনো চোখে বন্‌শীর দিকে কয়েক মুহূর্ত। ফিস ফিস করে বললে, "যাও মাঝি।

বন্‌শী পুঁটলি বাঁধা লাঠিটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, "যাই তবে সয়া। দিনের আলোয় দেখতে আসব আবার—দিন যেদিন আসবে। আজ পালাচ্ছি অন্ধকারে। ভেবোনি তুমি। আমি জানি সাঙাৎ ভোর একদিন আসবেই—মোদের জংগল যেদিন ঘুরিয়ে নেবো, জমিন যেদিন মোদের হবে। সেদিন কেউ ছেড়ে যাবেনি আর গাঁয়ের মাটি।"

এক দৃষ্টে গভীর কালো চোখ দুটো মেলে চেয়ে রইলো মংলা। পাথর কুঁদো মুখে ঠোঁট দুটো শুধু নড়ে উঠলো একবার—কিন্তু কিছু বললে না।

বন্‌শী দাওয়া থেকে নেমে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেল।

সেই দিকে শুকনো চোখ মেলে চেয়েছিল মংলা। হঠাৎ মনে পড়লো, তাইতো—সেই যে বিদেশীর হাতে টাঙিটা ছিল একদিন, সেটা তো দেওয়া হলো না!—

সামনের চালেই গোঁজা ছিল সেটা। তাড়াতাড়ি সেটা পেড়ে নিয়ে ছুটলো সে বনের দিকে। সামনে বন্‌শী যাচ্ছে!

পেছন থেকে ডাকলো মংলা, "মাঝি।"

বন্‌শী ঘুরে দাঁড়ালো।

মংলা বললে, "তোমার টাঙি।"—

"টাঙি!" বন্‌শী বললে, "থাক সয়া ওটা তোমার কাছে। তোমার ছেলে হলে তার হাতে দিয়ে বোলো মোর কথা। বোলো মোর সাঙাৎকে।" এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো মংলা।

তারপর টাঙিটা নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলো ঘরে। এসে কুঁড়ের ঝাঁপ বন্ধ করে হু হু করে কাঁদতে লাগলো উপুড় হয়ে। কেন যে কাঁদলো মেয়েটা—শুধু সেই জানে।

হটাবাহার

ননী ভৌমিক

দূরে ভুটান পাহাড়ের নোংরা নীল পিঠ কুঁজো হয়ে উঠেছে। নীচে পাহাড়-তলির ছাইরঙা মাটির ঢালুতে ঝোপ ঝোপ হয়ে ছড়িয়ে আছে বাগানের পর বাগান। মাইলের পর মাইল জুড়ে ডুয়ার্সের চা এলাকা গিয়ে মিশেছে আসামের পাহাড়ে।

এখানে তারা জন্মায়নি। এখানকার মানুষ নয় তারা। মদেশী, মুণ্ডা, বিলাসপুরের আর ছোটনাগপুরের অধিবাসী—ঝুঁটি-বাঁধা লম্বা চুল, লোহার বালা-পরা পাকানো কব্জি, নেংটি-পরা বুনো মানুষ—থাক থাক মাংসের ভাঁজে শক্ত কালো পিঠ এখানকার হাওয়ায় শিটিয়ে আসে। নীচু হয়ে চায়ের পাতা তুলতে তুলতে বেঁকে যায় কোমরের হাড়। ম্যালেরিয়া ধরে—চা বাগানের দুরন্ত ম্যালেরিয়া।

কিন্তু দেশে ফিরে যায় না কেউ। যারা পালাবার চেষ্টা করেছে—পনের বিশ বছর পরে যারা ছুটি পেয়েছে, দু মাস যেতে না যেতেই তারা ফিরে এসেছে আবার। ঠিকাদারের হাতে পায়ে ধরেছে ঃ

'ক্ষেতি গিরস্তি কিছু নাই দেশে। কি করব বল বাবু ?'

পনের বিশ বছর আগে আদিবাসীদের নীচু দেওয়াল ঘেরা মাটির ঘরে এসে বসেছিল একজন। চকচকে পেতলের বোতাম-আঁটা কোট পরা, নিকেলের চেন ঝুলানো, লোহার নাল মারা কালো চামড়ার জুতো পায়ে।

'ক্ষেতি গিরস্তি কিছু নাই তোদের ?'

মোচে পাক দিতে দিতে ছোটনাগপুরের শক্ত বেঁটে গেরুয়া পাহাড়ের অনুর্বর মাটির দিকে চেয়ে বলেছিল ঠিকাদারবাবু। জংলী মানুষরা হাঁ করে চেয়ে থেকেছে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ একসঙ্গে সায় দিয়ে ফেলেছে সবাই।

'কোথা পাবি ? কিছু নাই। ধান পান কিছু নাই আমাদের। জমিগুলি কেড়ে লিলে উয়ারা—'

এ বস্তি আর ও বস্তি এ গাঁ আর ও গাঁ থেকে আরো লোক জুটেছে।

সবাইকে একসঙ্গে করে নিয়ে এসেছে স্টেশনে। নিজের পয়সা খরচ করে হলদে হলদে পুরু পুরু টিকিট কিনেছে লোকটা। সযত্নে তা রেখে দিয়েছে চেন্ ঝুলানো কোটের বুক পকেটে।

'কোথায় লিয়ে যাবি আমাদের ?'

'খাটবি। পয়সা মিলবে। হাঁড়িয়া খাবি ? কি বলছিস রে, সোমন ?'

'হাঁ পয়সা মিলবে খাটবো...'

তারপর অপরিচিত পাহাড়—অপরিচিত বোবা মানুষ। হাজার একর বাগানের বাইরে পা বাড়াবার হুকুম নেই। দেশে পালাবার চেষ্টা যে করেছে, চৌকিদারের হাতে ধরা পড়ে ফিরে এসেছে সে।

পনের বছরের মধ্যে নাকি দেশে ফেরা চলবে না। ঠিকাদারবাবু টিপসই নিয়ে রেখেছে।

হাজার একর বাগানটাকে দেখায় একটা নিস্তব্ধ জেলখানার মতো। কাঁটা-তারের বেড়ার পাশে পাশে কড়া নজর রেখে বসে আছে চৌকিদারেরা।

দেশে ফিরে যেতে চায় না কেউ। ছেলেমেয়ে জোয়ান বুড়োর একটা কুৎসিত দুর্বল উপনিবেশ আবদ্ধ জলের মতো গাঁজিয়ে ওঠে। হাঁড়িয়া খেয়ে কুলি লাইনে লাইনে ভাঙা ভাঙা হল্লা করে। হল্লা থেমে গেলে হঠাৎ একদিন কি মনে পড়ে যায় আবার। চাপা কান্নার মত নীচু একঘেয়ে সুরে হঠাৎ গান গাইতে শুরু করে কয়েকজন। বুনো অস্পষ্ট গান। হঠাৎ তেমনি আকস্মিকভাবে থেমে যায় একসময়।

তিরিশ চল্লিশ বছরের এমনি আতঙ্কিত জীবনযাত্রা ঘা খেয়ে থমকে গেল একদিন। বাজারে ধানের দর উঠেছে তের টাকা মণ।

'পাঁচ আনা হাজিরা দিবি তো কি খাব, কি করব ?'

যারা জিজ্ঞেস করল তাদের আতঙ্কিত মুখ চোখ কেমন রুক্ষ দেখাল। অনেকদিন বাদে চা বাগানের গুদামের দিকে আঙুল দেখিয়ে অনিশ্চিতভাবে জিজ্ঞেস করলে কয়েকজন—'কত ধান রেখেছিস ওখানে ?'

কিন্তু আর কিছু হয় না। আকাল শুরু হতে বছর তিনেক হল বাগানের ভেতর চা বাগানের পাশে আরো একটা গুদাম উঠেছে। চায়ের নয় চালের। খাসমহলের বনজঙ্গলে লুকানো জোতদারদের হাজারমণী গোলা থেকে লরী বোঝাই ধান আসে গুদামে। রাত্রের অন্ধকারে আবার বেরিয়ে যায়

কোথায়। গুদামের দরজায় ডবল পাহারা বসিয়ে বড়বাবু হেসে বাগানবাবুকে বলেন—

'টাকা রোজগার নিয়ে কথা। না কি বলো হে ?' উত্তরে কুলি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে টিপে হাসে বাগানবাবু। হাসে আর চোখ টেপে।

'তিন সের রেশন তো কজন লোক খাবে ?'

কুৎসিত চেহারার কুলি মেয়েরা অনিশ্চিতভাবে জিজ্ঞেস করে। তারপর উত্তর না পেয়ে ফিরে চলে যায়।

তাই রবিবারের হাটে ভিড় করে সবাই। বিস্তীর্ণ ডুয়ার্স এলাকা জুড়ে বাগানে বাগানে সপ্তাহে একটা দিন মজুরি বন্ধ—কাজ বন্ধ! কোম্পানীর জমিদারীতে হাটখোলায় হপ্তায় কড়ি গুনে সওদা কেনাবেচা চলবে। বাগানের বাইরে খোলা রাস্তায় সপ্তাহে একদিন ছুটি।

বড় বড় ফুটো করা কানের ভেতর লাল কাগজের অলংকার। পিঠে ছেলে বেঁধে রুক্ষ চুলে তেল মেখে কুলি মেয়েরা ঘোরাঘুরি করে ধানহাটির আশে পাশে। কিছু বলে না। হয়রান হয়ে মরদেরা গিয়ে বসে দূরের গাছতলায়। কড়া তামাকের চুরুট বানিয়ে ধোঁয়া টানে। অকারণে ঝগড়া বাধায় অন্য কুলির সঙ্গে। ঝগড়া করে ক্লান্ত হয়ে আক্রা দ'রের চাল কিনে নিয়ে যায় কোঁচড়ে বেঁধে।

'কি হল দেশটায় ? টাকায় তিন সের ধান ?'

'তো গুদামে পাহারা বসালে কেনে ওরা ?'

'দুটো চৌকিদার বসালে কেনে ?'

ধান কেনে না শুধু শুকরা মুণ্ডা।

শক্ত লম্বা শরীরের ওপর ছেঁড়া ফতুয়াটা আঁট হয়ে বসেছে। নেংটির নীচে শক্ত পা জোড়া অসম্ভব ঢেঙা দেখায়। পায়ের ডিমের ওপর সাপের মত কালো শিরার জট কুঁকড়ে উঁচু হয়ে আছে।

'টাকায় তিন সের ধান কেনে লিব ?'

খাসমহলের দেশী আধিয়ার চাষীরা খালি বস্তা বগলে করে গুম হয়ে ঘোরাঘুরি করে। বস্তা খুলে স্তূপ করে ধান রেখেছে পাইকাররা। হাওয়া দিয়ে ওপরকার ভুসি আর ধুলো উড়িয়ে দিচ্ছে আর হঠাৎ তকতকে পরিষ্কার হয়ে উঠছে ধানের গা।

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অনেকক্ষণ পরে কাঁপা হাতে ময়লা মোট নিয়ে এগিয়ে আসে দু-একজন। বস্তার মুখ ফাঁক করে সতর্কভাবে চেয়ে থাকে দাঁড়িপাল্লার দিকে। টাকা নিয়ে পাইকার যে ধান মেপে দেবে তাতে বিরাট বস্তাটার একটা কোণও ভরবে না।

শুধু ঢেঙা মদেশী কুলি শুকরা মুণ্ডা সন্ধ্যে পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ধান-হাটির পাশে। কিন্তু ধান কেনে না। তার বদলে কখন একসময় ভাটিখানায় ঢুকে পড়ে ও।

যখন বেরিয়ে এল তখন ওর ঢেঙা ঠ্যাং জোড়া দুলছে ঝড়ে নাড়া খাওয়া শাল গাছের মত। মুখের কস বেয়ে হাঁড়িয়ার ফেনা খানিকটা জমে আছে নোংরা হয়ে।

যারা ধান কেনে আর যারা ধান কেনে না সবাই চলে যায় আস্তে আস্তে। নির্জন হয়ে আসে কোম্পানীর হাটখোলা। রাস্তার কোণে ঘোলাটে আলো জ্বালিয়ে টিম টিম করে মানসিং-এর চাখানা।

'চা খাবো আমরা, চা দে—'

দোকানের সামনে পাটাতনের ওপর উঁচু হয়ে বসে শুকরা মুণ্ডা। দোকানের মালিক ভুটিয়ালি মানসিং চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা বেঁকিয়ে নিস্তব্ধভাবে চা বানায়। একটা চোখ ওর কানা। জামার নীচে পিঠে হাতে আর কাঁধে আরো কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন লুকিয়ে রাখে ও। তখন ও কুলির কাজ করত বাগানে। সেই বাগানের বড় সায়েব একদিন পাহাড়ের উপর শিকার করতে গিয়ে যত কটা গুলি ছুঁড়েছিল সবকটাই এসে লেগেছিল চা-কুলি মানসিং-এর দেহে। পাহাড়ী কুলির জান্—তাই মরে গেল না বোধ হয়। দশ টাকা বকশিশ দিয়ে সাহেব বলেছিল—ভাগো আমার বাগান থেকে।

বোকার মত জখম হাত তুলে সেলাম দিয়েছিল মানসিং। দশ টাকা বকশিশ্ পেয়ে কেমন খুশি হয়ে গিয়েছিল সে। বড় সায়েবের কাছে যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল শুধু ততক্ষণ।

কিন্তু তারপর থেকে আতঙ্কের তীব্র একটা ছায়া ভোঁতা চামড়ার মতো এঁটে বসেছে ওর কানা মুখের ওপর।

চাখানার বেঁটে বোঁচা ছুকরি মেয়েটা শুকরাকে চায়ের গেলাস এগিয়ে দিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়।

ভাল লাগে মেয়েটিকে। সারাদিন একটার পর একটা ফাইফরমাস খেটে যাচ্ছে। জল বইছে, বাসন ধুচ্ছে, জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে আনছে পাহাড় থেকে। যারা নেশা করে আসে তাদের ভাল লাগে। লম্বা চওড়া কথা বলতে ইচ্ছে করে। গোর্খালি চৌকিদারেরা ভোজালি উঁচিয়ে হিম্মৎ দেখায়!

টিমটিমে দোকানের ভেতর থেকে হঠাৎ মানসিং মাথা ঝাঁকাতে শুরু করে।

'পহলে তো হাম চা-কুলি থা। তো কেয়া দেখা কি বড়াসাব ইধারসে গিয়া তো বিলকুল ভাগ গিয়া কামিন লোগ। ইতনা ডরতা থা কামিন লোগ…'

'কি বলছিস তুই ?'

চোখ কুঁচকে মাথার টাল সামলাতে সামলাতে শুকরা তাকায় মানসিং-এর দিকে। কসের ওপরকার হাঁড়িয়ার ফেনাটুকু চাটতে থাকে বোকার মতো।

ভুটিয়া টান মেশানো আধা হিন্দিতে আপন মনে বলে চলে মানসিং ঃ

'পহলে কেতনা ডর থা। আভি কেয়া হুয়া ? আঁখ দেখা কুলি লোগকা ? হায়রে বাপ! রুপেয়ামে তিন সের চাউল। খরিদ করনে নেহি সকা। লেকিন আঁখ দেখা উনলোগোঁকা ?…

কিন্তু সোমবার থেকে অন্য তাগিদ আসে। কিছু ধান কিনেছে অথবা মোটেই ধান না কিনে যারা হাঁড়িয়া খেয়ে এসেছে সবাই সকালবেলার বাসি মুখে বেতের টুকরি নিয়ে ধীরে ধীরে বাগানের পথে পা বাড়ায়।

আশ্বিনের প্রথম। দু মাস ধরে বেঁটে বেঁটে চা গাছগুলো কচি পাতায় ছেয়ে যাচ্ছে। 'হুড়পাতি' বলে এই সময়টা। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দামী নতুন পাতাগুলো তুলে নিতে হবে এখন। যত তুলে নেওয়া যাবে তত নতুন পাতা গজাবে এই সময়টা। এখন কাজ কামাই হওয়া মানে বিস্তর লোকসান। কোম্পানী আইন করে দিয়েছে—যত পাতা টিপতে পারবে তত পয়সা।

তবু কতই বা হয়। দিনের শেষে সাত আনা আট আনা।

ননী ভৌমিক

পা টিপে টিপে কষ্টে হাঁটছিল মুংলী, শুকরার বৌটা। পেটের ভেতর দশ মাসের ছেলে নিয়ে কত পাতাই বা ও টিপবে। কতই বা রোজগার করবে। কাল রাতে মিছিমিছি পয়সা উড়িয়েছে মনে পড়ে উশখুশ করে শুকরা। ঘরে ছ-বছর আর চার বছরের দুটো বেটা আছে শুকরার। খিদের জ্বালায় এতক্ষণ নোংরা উঠানে পড়ে বেড়ালের বাচ্চার মতো আঁচড়া আঁচড়ি করছে হয়ত।

'তুই ফিরে যা মুংলী। একলা দু টুকরি পাতা টিপব আমি—'

কষ্ট হচ্ছিল মুংলীর। মাটির ওপর বসে জিরিয়ে নিল খানিক। তারপর আবার পা ঘসে ঘসে হাঁটতে শুরু করল।

'তুই ফিরে যা মুংলী—'

'ধান পান নাই ঘরে। একটা মরদ কত কামাই করবে? দুজন না খাটলে মারা যাবে ছেলেগুলো—'

ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ তুলে ক্লান্ত প্রশ্ন করে কুৎসিত চেহারার জংলী মেয়েটা।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু টুকরির সিকি ভাগও ভরাট হল না মুংলীর। শুকরা জানতে পারেনি। কাজ শেষ হবার ঘণ্টা বাজার আগে একটা বুড়ি কুলি মেয়ে শুকরাকে খবর দিল—

'তুই পাতা টিপছিস শুকরা? মুংলী পড়ে আছে পছিম বাগানে—'

তাতে অবশ্য ব্যস্ত হবার কারণ নেই। এরকম তো হয়েই থাকে। ঘণ্টা বাজার আগ পর্যন্ত পাতা তুলে টুকরি ভরে যেতে হবে শুকরাকে। নয়ত দু-চার পয়সা কম মজুরি মিললে মন বিগড়ে থাকবে সারা দিন।

ঘণ্টা বাজলে মুংলীর কাছে গেল শুকরা। এতক্ষণ শুয়েছিল মুংলী—এইবার উঠে বসেছে। সদ্যপ্রসূত তামাটে লাল বাচ্চাটাকে শুইয়ে রেখেছে মাটির ওপর।

'ঘরে চল শুকরা—'

'চল'

ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতেও হাঁপিয়ে উঠেছে মুংলী।

'কাল থেকে তোকে একলা খাটতে হবে শুকরা—'

আক্রা দরের ধান যারা কিনেছিল, আর ধান না কিনে যারা হাঁড়িয়া খেয়ে হপ্তার কড়ি বেহিসাবী খরচ করে এসেছিল—তাদের প্রত্যেকের অবস্থা সমান

হয়ে আসে তিন দিন পর। হপ্তা শেষ না হলে মজুরি মিলবে না। ধানের পর মকাইয়ের ছাতু—তাও শেষ হয়ে যায়।

বাঁকাচোরা সারবন্দী কুলি লাইনটা অত্যন্ত নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। সারাদিন খাটুনির পর অর্ধেক লোক কাত হয়ে পড়ে থাকে স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর। অর্ধেক লোকের ঘরে এক কণা দানা নেই। ভুখা, স্রেফ ভুখা। হি হি করে কেঁপে বড় ছেলে দুটোর জ্বর এসেছে। কচি ছেলেটাকে বুকের কাছে টেনে মুংলী হঠাৎ ফ্যাকাশে গলায় ডাক দেয়ঃ

'শুকরা'

'কি বলছিস ?'

'আমাকে ছেড়ে তুই পালাবি শুকরা ?'

ক্লান্ত সন্দেহে মুংলী তাকায় শুকরার দিকে। ঘরে ঘরে এমনি সন্দেহ উঁকি দেয় প্রত্যেকেরই মনে। যে মরদ খাটতে পারে সে কেন অক্ষম বৌ ছেলের জন্যে উপোস দেবে। যে মেয়ের গতর আছে সে কেন বুড়ো বাপের জন্যে আক্রা ধান কিনে দিয়ে নিজে শুকিয়ে থাকবে ?

কূল কিনারা না পেলে তাই একদিন চা বাগানের কুলিকে পালাতে হয়। যে মেয়ের গতর আছে তাকে ফুসলিয়ে বার করে এনে কাজ নেয় দূরের বাগানে। আর, তেমন দোষ দেয় না কেউ। শুধু অক্ষম বৌটা পড়ে পড়ে গাল দেবে কিছু দিন—বুড়ো বাপটা শুকিয়ে মরে থাকবে কুঁড়ের ভেতর। আর, তেমন দোষ দেবে না কেউ।

'আমাকে ছেড়ে তুই পালাবি শুকরা ?'

কাঁপা আতঙ্কে বার বার জিজ্ঞেস করে মুংলী।

'সে কথা কেনে বলছিস তুই ?' বিরক্ত হয়ে শুকরা অন্যদিকে তাকায়। দেবতার জন্যে মানত করা মুর্গীটার ঠ্যাং ধরে সন্ধ্যে রাত্রে গঞ্জে রওনা হয়ে যায় তারপর। গঞ্জের মুদি-দোকানে ধানের দর আরো বেশি—টাকায় আড়াই সের।

রাত একটু বেশি হলেও ফেরার পথে মানসিং-এর দোকানে বসে যায় একটু। কাঠ ফেড়ে ফেড়ে আগুন জ্বালাচ্ছে দোকানের মেয়েটা। রাত দিন খাটছে ও। গোল পাহাড়ী মুখের ওপর আগুনের ছায়াটা দপ দপ করছে। অন্যমনস্কভাবে শুকরা তাকিয়ে থাকে মেয়েটার দিকে।

হাত পা আগুনে সেঁকতে সেঁকতে মানসিং খবর দেয় ভাঙা হিন্দিতে 'কেয়া কিয়া, রাতমে গাড়ি গিয়া তো বোলা ঠারো। লেকিন লুঠ কিয়া নেই। বোলা রুপেয়ামে সাত সের লেও। পান শও আদমি তামাম গাড়ি রুখ দিয়া—খাসমহলকা আদমি। বোলা রুপেয়ামে সাত সের লেও...' অবাক হয়ে যায় শুকরা। কিছু বলতে পারে না। হঠাৎ লুব্ধভাবে জিজ্ঞেস করে—'আমাদের গুদামটায় কত চাল আছে তাহলে ?'

'পান শও আদমি লাঠি উঠায়া। বোলা রুপেয়ামে সাত সের লেও—আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে মানসিং একটানা বকে যায়। ওর মুখের ওপর ভোঁতা আতঙ্কের ভাবটা হঠাৎ যেন ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

দ্রুত পা চালিয়ে কুলি লাইনে ফিরে আসে শুকরা।

বাগানে ঢুকতেই এসে পথ আটকাল একজন চৌকিদার। অন্ধকারে আগুন জ্বালিয়ে বসে আছে আরও কয়েকটা মূর্তি! হঠাৎ পাহারার কড়াকড়ি শুরু হয়ে গেছে এখানে!

'কিধার গিয়া থা ? বাহারমে মাৎ যানা। যায়েগা তো আনে নেহি দেঙ্গে—'

'হুকুম হোগিয়া—'

'ধান কিনতে দিবি না তোরা ?'

'মাৎ যানা। ইয়ংটাং বাগানামে কেয়া হুয়া ? রেশনকে বারেমে মারপিট শুরু কর দিয়া কুলি লোগ। ও ? তুম্ ভি বদমাসী মতলব লেকে ঘুমতা ? মাৎ যানা—সাহেব কা হুকুম—'

অল্প রাত হতেই গোটা কুলি লাইনটা একেবারে নিঝুম হয়ে পড়েছে। অন্ধকারে ভাঙাচোরা সারি সারি ঘরগুলো ছায়া হয়ে জেগে আছে শুধু। শুকরার সাড়া পেয়ে একটা কুকুর নীচু গলায় কয়েকবার ডেকে চুপ করে গেল।

'বুধন, এ বুধন——...'

বুধনের নীচু দাওয়ায় উঠে হাঁকাহাঁকি লাগায় শুকরা। না, বুধন ঘুমায় নি। কুলি লাইনের কেউ ঘুমায় না, শুধু খিদে আর খাটুনিতে মড়ার মতো পড়ে ছিল সবাই—কেউ ঘুমায় নি।

উত্তেজিতভাবে শুকরা খবর দিল সবাইকে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে। কি

হয়েছে ? না খাসমহলের চাষিরা সবাই চালের গাড়ি রুখে দিয়েছে। লাঠি উঁচিয়ে বলেছে টাকায় সাত সের চাল দিতে হবে—কিন্তু লুঠ করেনি ওরা।

আর ইয়ংটাং বাগানে মার দাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে কুলিরা—সবাই শুনল কথাটা। একই কথা শুনল বার বার করে। চাপা লোভে একই কথা জিজ্ঞেস করল বার বার করে। তারপর ফিরে গেল নীচু অন্ধকার কুঁড়েগুলোয়। আর কেন জানি ঝগড়া করতে শুরু করল নিজেদের মধ্যে। একটা অনির্দিষ্ট চাপা রাগে হাত মুঠ করে রুখে রুখে উঠল, একজন আর একজনের ওপরে।

মাঝরাত্তিরে তাদের অকারণ চিৎকার ফাঁপা হল্লা হয়ে ছড়িয়ে গেল পাহাড়ে পাহাড়ে।

'পাঁচ আনা—'

'সাড়ে ছয় আনা—'

'সাড়ে ছয় আনা—'

'ন আনা ! আরে বাপ বহুত হোগিয়া তোমকো—'

'পাঁচ আনা—'

মুখস্ত বলার মতো করে বাগানবাবু হাজিরা হিসাব করে দিচ্ছেন। টাটকা তোলা কচি চা পাতার গন্ধে জায়গাটা ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে। এক একটা টুকরি টেনে এনে ওজন করার যন্ত্রে ঝুলিয়ে দিচ্ছে কুলিরা। এক ঝলক তাকিয়ে দেখছেন বাগানবাবু আর হাজিরা হাঁকছেন।

একলা তিন টুকরি পাতা টিপেছে শুকরা। একলার রোজ রোজগারে পাঁচটা প্রাণীকে খাওয়াতে হবে। তিন টুকরি পাতা আগলিয়ে জানোয়ারের মতো হাঁপায়।

'এক টাকার কম লিব না—'

শুকরা আগে থেকে সতর্ক করে দেয় বাগানবাবুকে। বাগানবাবুর তাকিয়ে দেখারও সময় নেই। একঘেয়ে হাজিরা হেঁকে যাচ্ছেন আর ওজন দেখছেন।

যত ওজন হয় খাতায় তা লেখা হয় না। সেরের ওজন পাউণ্ড বলে চলে। মাথা মুণ্ডু কি হিসেব হয় লেখাপড়া না জানা জংলী কুলিরা কেউ ঠাহর পায় না। জিজ্ঞেস করলে জবাব মিলেছে ওজন কাটতে হবে না। পাতার সঙ্গে

জলের ওজন মাপতে হবে নাকি ? কোম্পানী শুকনো পাতা চালান দেয়—কুলিরা রসালো কচি পাতা তুলে এনেছে। লোকসান হবে কার ?

'একটাকার কম লিব না—'

শুকরা ঘাড় টান করে আবার জানিয়ে দেয়। বাগানবাবু কেয়ার না করে টুকরি চাপাতে বলে—

'আট আনা···কুড়ি সের ওজন কেটে নিলাম তোর—'

'কুড়ি সের ?' জঙ্গলের বাঘের মতো স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে শুকরা তারপর হঠাৎ গোঁয়ার দুই হাতে টুঁটি চেপে ধরে বাগানবাবুর।

'কুড়ি সের কেটেছিস তুই বাবু ? আট আনা মজুরি দিবি আমাকে ?'

হঠাৎ যেন পাগলা ঘণ্টি বেজেছে পাহাড়তলির জেলখানায়। একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছে নির্বাসিত কয়েদীরা।

'মজুরি কাটবি—ধান দিবি না ?'

'ধান দে আমাদের—ভুখে আছি—'

মদেশী আর ভুটানী মেয়েরা চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। কি করতে হবে বুঝতে পারছে না—রুখে রুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুলি মরদেরা।

বড় সায়েবের কুঠি থেকে গুলি ছোঁড়ার শব্দে গণ্ডগোলটা আচমকা থেমে গেল। স্তম্ভিতভাবে এর ওর দিকে তাকাল কুলিরা। বুধন কুলি টুকরির ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে।

নিঃশব্দে টুকরি চাপাতে লাগল ওজনের যন্ত্রে। কি করতে হবে কেউ জানে না।

অস্বাভাবিক রকমের গুম মেরে আছে কুলিরা। তীব্র টর্চের মুখে জঙ্গলের পথ যেমন পাথর হয়ে যায়। বিচক্ষণ শিকারীর চোখ সতর্ক হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

'এক সের করে ধান বিলি করে দিন বড়বাবু—চারদিকে বড় হাঙ্গামা হচ্ছে।'

পাগলা হাওয়ার ধুম পড়ে গেছে জঙ্গলে। হাওয়া পালটিয়েছে। জংলী লতাপাতার অপরিচিত গন্ধের টানে পাগলা হয়ে উঠেছে জানোয়ারের পাল। ছোট সায়েব ইতস্তত করে জানালেন—'ধান তো নেই। পরশু রাত্রে যে ট্রাক গেছে সেই শেষ—'

সন্ধ্যেবেলায় শুকরার ডাক পড়ল সায়েবের কুঠিতে। দুজন চৌকিদার ধরে নিয়ে এল শুকরাকে। বাংলোর বারান্দায় চাবুক হাতে করে বড় সায়েব পায়চারি করছে। ঘরের ভেতর থেকে সিল্কের পর্দাটা সরিয়ে উৎসুকভাবে চেয়ে আছে সায়েবের রক্ষিতা কুলি ছুকরিটা। নির্বোধ কৌতূহলে ওর গোল গোল চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে।

চাবুকের দাগে দাগে রক্তের সঙ্গে ছেঁড়া ফতুয়াটা কেটে বসেছে পিঠের ওপরে। কুঠি থেকে টলতে টলতে নেমে এল শুকরা। হটাবাহার।

চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর বাগান ছেড়ে দিতে হবে ওকে। ঘরে ঢুকে লাঠি মেরে মেরে জিনিসপত্র তছনছ করে দেবে চৌকিদারেরা। পোড়া মাটির হাঁড়িকুঁড়ি ফাটিয়ে ছত্রখান করবে—নিষ্ঠুর আনন্দে ধুলোয় ছড়িয়ে দেবে মকাইয়ের ছাতু, ধান ভানার অবশিষ্ট খুদ।

কোন বাগান আর চাকরি দেবে না ওকে। কাল সকালে বড় সায়েবের সই করা চিঠি চলে যাবে সব জায়গায়—

এক বদমাস কুলিকে হটাবাহার করেছি—হুঁশিয়ার, কাজ দিও না ওকে, সব গড়বড় করে দেবে—

তীর-বেঁধা জানোয়ারের মতো টলতে টলতে বাড়ি এসে মেঝের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে রইল শুকরা। ছটফট করল না। চিৎকার করল না।

এক এক করে জন কুড়ি কুলি দেখতে এল ওকে। তাদের সবারই ওপরে হুকুম হয়ে গেছে—হটাবাহার। বাগানবাবু যাদের নামে চুকলি কেটেছে তাদের কারো নিস্তার নেই—

'কি করব বল শুকরা—'

'কি করব! কাল সকালে আসিস—' যন্ত্রণায় দাঁত চেপে উত্তর দিল শুকরা।

কুলিরা সবাই বসে যাবে বলছে। বলছে কেউ কাজে যাবে না—

তামাটে লাল ছেলেটাকে বুকে নিয়ে ঘেঙিয়ে ঘোঙিয়ে কাঁদছিল মুংলী। ঠিক কান্না নয়—কেমন এক ধরনের একটানা আরণ্যক চিৎকার। কিন্তু শুকরার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে চুপ করে গেল ও। শুকরার চোখে পাপ নেই; ভয় নেই, শুধু যন্ত্রণা আছে—

আশ্বস্ত হয় মুংলী।

ননী ভৌমিক

লম্বা কুলি লাইনটা থেকে একটা শক্ত হল্লা গোঁ গোঁ করে উঠছে মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে চৌকিদারদের আতঙ্কিত হাঁক শোনা যায় দূর থেকে। জুতো মস্‌মসিয়ে পাথর নুড়ির ওপর দিয়ে কেন জানি ছুটে ছুটে যাচ্ছে কোথায়।

'বাহার সৈ কোই আদমি ঘুসা হোগা তো পাকড়ো—হুঁশিয়ার—'

কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে সব।

'হাঁড়িয়া—হাঁড়িয়া—'

সায়েব ডেকেছে কুলিদের। প্রথমে অস্বস্তি বোধ করেছিল—ইতস্তত করেছিল—তারপর যে বারোজনকে হটাবাহার করা হয়েছে তারা ছাড়া সবাই গিয়ে জুটেছে কুঠির সামনে। ছেলে মেয়ে বুড়ো। 'বকশিশ দিবি, বকশিশ?'

'হাঁড়িয়া—হাঁড়িয়া—'

হঠাৎ সায়েব সদয় হয়ে উঠেছেন। দু আনা করে বকশিশ ছুঁড়ে দিয়েছেন সবাইকে। চুরি করে চোলাই করা হাড়িয়ার জ্বালা নামিয়ে দিয়েছেন কুলিদের ভেতরে।

'নাচ তোরা—নাচ দেখি মেয়ে মরদে—' কুৎসিত চেহারার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বাগানবাবু আবার চোখ টেপার চেষ্টা করেন।

ডুম—ডুম—ডুম—

কয়েকজন এলোমেলো ঘা দেয় মাদলে। টলতে টলতে নাচতে শুরু করে কুলি মরদেরা। লাল কাগজের অলংকার গোঁজা কানের ওপর হাত দিয়ে রুক্ষ চুলের গোছা ঠিক করে নেয় মেয়েরা……

হঠাৎ ভুলে গেছে সবাই, মাতাল হয়ে গেছে। সায়েব সিগারেট ধরিয়ে পাহাড়ে হরিণ শিকার করতে বেরিয়ে যান।

দূরে ভাঙাচোরা কুলি লাইনটা কেমন ঠুনকো দেখায়। অদ্ভুত নোংরা লাগে।

পচা পাতায় শুকনো আসাম লতা খুঁশে খুঁশে নড়বড়ে কুঁড়ে। মাটি লেপা। ভাঙাচোরা ছনের চাল্ ফাঁক হয়ে একফালি আকাশের দিকে উন্মুক্ত। নোংরা কয়েকটা মুর্গীর বাচ্চা যাতায়াতের সংকীর্ণ পথে ঠোকর দিয়ে বেড়ায়।

কুড়িজন বহিষ্কৃত শ্রমিক দূর থেকে ওদের মাতলামি চেয়ে চেয়ে দেখে। ওরা সব ভুলে গেছে। হাঁড়িয়া ওদের সব ভুলিয়ে দিয়েছে। পিঠের জন্য নয় অন্য একটা যন্ত্রণায় মুখ থমথম করে ওঠে শুকরার।

আতঙ্কে থমকে যায় মুংলী—'তুই পালাবি শুকরা। তোর চোখে পাপ আছে। আমাকে ছেড়ে তুই পালাবি…'

'তুই খাটতে পাররি না। আমাকে কাজ দিবে না কোন বাগানে—'

খালি পেটে নেচে চলেছে। খালি পেটে হাঁড়িয়ার নেশা চট করে মাথায় গিয়ে ওঠে।

'আজ আমরা বাগানে খাটবো না—'

'খাটবি না তো নাচ। নাচ দেখি মেয়ে মরদে—'

তেমন নাচ জমে না। কেমন এলিয়ে যায়—কেটে কেটে যায়। আবার নাচতে শুরু করার চেষ্টা করে।

বোকার মতো ওদের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে যায় শুকরা।

হাটবার নয়—মানসিং-এর দোকানটা কেমন মরা নিঃসঙ্গ। সামনে গাছতলায় ছেঁড়া পায়জামা টুপি পরা জন তিনেক শুকনো চেহারার ভুটিয়া এসে ডেরা বেঁধেছে। কাজ খুঁজতে এসেছে বাগানে। দু দিন উপোস দিয়ে পড়েছিল—আজ তিনটে রুটি খয়রাত করেছে মানসিং। লোকগুলোর চোখে মুখে একটা হন্যে ভাব। দেশের লোক মানসিং-এর সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পায়।

বিড় বিড় করে বকতে বকতে মানসিং ফিরে এল দোকানে। শুকরা বসে আছে বেঞ্চিটার ওপর। কালো পিঠের ওপর পাটকিলে হয়ে রক্তের চাপ বেঁধেছে।

'আরে বাপ। কেয়া হুয়া ?'

'কি বলছিস ?'

'কেয়া হুয়া হামকো বলো—'

'হটাবাহার করে দিল সায়েবটা' গুম মেরে জবাব দেয় শুকরা।

মানসিং বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শুকরার দিকে। কানা বুড়ো মুখের ওপর থেকে চিরস্থায়ী আতঙ্কের ভাবটা কেটে গিয়ে কেবল একটা তীব্রতা

প্রকাশ পেয়েছে। হঠাৎ গায়ের কুর্তাটা খুলে ফেলল মানসিং। হাতে কাঁধে পিঠে তিন চার জায়গায় গুলির পুরনো দাগ। বেঁটে বেঁটে আঙুল দিয়ে এক একটা দাগ দেখায় আর বলে—

'পহলে গোলি মারা তো খাড়া থা হাম। ফির এক গোলি মারা…তব ভি খাড়া থা। তো ফির এক গোলি মারা—সায়েব মারা…'

কি জন্যে এসব কথা বলছে মানসিং? ভাল লাগে না শুকরার।

চায়ের গেলাস নিতে এসে দোকানে খাটিয়ে মেয়েটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। 'হটাবাহার কর দিয়া?'

এই প্রথম কথা বলল মেয়েটা। কথা বলা ওর অভ্যাস নয়। মুখ বুজে কাজ করে যায় শুধু। গোল কপালের ওপর কটা চুল কয়েকটা সোজা হয়ে পড়ে। সেই দিকে তাকিয়ে ঝোঁকের মাথায় শুকরা বলে—

'পালিয়ে যাব আমি। মুংলীটা খাটতে পারবে না আর। তুই চল আমার সাথে—'

'হুম?' খানিকটা অবাক হয়ে মেয়েটা তাকায়। তারপর কিছু না বলে চায়ের গেলাস তুলে নিয়ে চলে যায়।

'কেতনে ডর থা পহলে। সায়েব দেখকে ভাগতা থা কুলিলোগ। অভি কেয়া হুয়া? কোই ভাগে গা?…'

আপন মনে বিড় বিড় করে বকে চলেছে মানসিং।

রাস্তার মোড় ফিরছে শুকরা এমন সময় পেছন থেকে ডাকল—'শুনো—' দোকানের মেয়েটা। ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়চোপড়ের একটা ছোট বোঁচকা হাতে নিয়ে পিছু পিছু চলে এসেছে।

'আবার একটা বাগানে কাজ লিব আমরা। তুই খাটবি আমি খাটব—'

মেয়েটা গোল চোখ তুলে শুকরার দিকে তাকায়।

'তুই মারবি আমাকে? কাজ করতে না পারলে তুই মারপিট করবি, শুকরা?'

'তোকে কেনে মারব। মুংলীটা খাটতে পারে না…'

'নাচ দেখি—কি হল তোদের?'

ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় ফুর্তি। নেশা জমে ওঠে না। নাচ থামিয়ে একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণায় হঠাৎ চুপ করে যায় সবাই।

'তোর ফুর্তি হল বাবু? আমরা কি করব? হাঁড়িয়া দিলি ধান দিলি না—'

'না, ধান দিলি না—' অন্য কুলিরা আফসোস করে—আর কেমন কঠিন শোনায় তাদের মাতাল কণ্ঠস্বর।

'শালা। কি হল তোদের?' অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়ান বাগানবাবু।

এদিকে চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেছে। কুলি লাইনের নোংরা সরু রাস্তাটা লাঠি ডাণ্ডা নিয়ে টহল দিচ্ছে চৌকিদারেরা।

'ভাগো। ভাগো আভি, নেহি তো...'

বাঁকাচোরা ছনের চাল লাঠির ঘায়ে ভেঙে পড়েছে। নোংরা কাঁথা, কাপড়, মাটির হাঁড়ি, বেতের টুকরি টেনে এনে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে ধুলোয়। ছড়ানো ছিটোনো জিনিসপত্রের ভেতর উজবুকের মত বসে রইল কুড়িটা উদ্বাস্তু পরিবার।

'ভাগো—ভাগো—জলদি'—টহল দিতে দিতে কি মনে হয় দু-এক ঘা লাঠি বসিয়ে দেয় চৌকিদারেরা। অসহায়ভাবে খালি হাত আড়াল দিয়ে আঘাত যথাসম্ভব আটকাবার চেষ্টা করে মরদেরা। আর তবু বকে যাবে।

'মার তোরা, মেরে ফেল আমার ছেলেটাকে'—তামাটে বাচ্চাটাকে হঠাৎ চৌকিদারের বুটের কাছে ছুঁড়ে ফেলে চাপা আক্রোশে হিসিয়ে ওঠে মুংলী।

একটা কচি হাত বুটের তলায় পিষে যায়।

'কি করবি তুরা; খুন করবি?' অনিশ্চিতভাবে অন্য লোকেরা ফিরে দাঁড়ায়। ওদের চেখে একটা অনির্দিষ্ট ছায়া থম্ থম্ করে।

'ধান দিলি না—হাঁড়িয়া দিলি বাবু—?'

যারা নাচছিল তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এদিকে। টল্‌তে টল্‌তে আসে। আর ভয়ংকর দেখায় তাদের এলোমেলো অনির্দিষ্ট ক্রোধ।

আফিমের নেশা কেটে গিয়েছে জানোয়ারের চোখ থেকে। ছোটনাগপুরের গেরুয়া পাহাড়ের কুহক নেমেছে দলকে দল মদেশী কুলিদের পেশীতে। রক্তের মধ্যে এক আদিম দুর্বোধ্য ডাক শুনে জানোয়ারের পালের মতো চকিত হয়ে উঠেছে সবাই।

কয়েকটা ফায়ার করে সায়েব আর বাবুদের প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে খেপা মানুষের সামনে থেকে। তিনজন কুলি মরে পড়ে আছে কুঠির ময়দানে।

শুধু ধান নাই গুদামে। সায়েব ঠকিয়ে গেছে। একবার দমে যায় সবাই। যন্ত্রণায় কালো হয়ে যায় মুখ চোখ।

'ধান নাই। তিনটে কুলি মরে গেল আমাদের…'

'কি করব বল ?'

'কি করব আমরা। সায়েব পালিয়েছে বটে কিন্তু শিগগিরই ফিরে আসবে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে। কিছু জিজ্ঞেস না করে বেপরোয়া গুলি চালাবে তারা। খুন হয়ে যাবে মানুষ।'

কিন্তু কেন জানি এই প্রথম পরস্পরকে গালাগালি দিল না কেউ।

'কি করব বলছিস ?'

দু-একজন স্থিরভাবে তাকায় তারপর চলে যায় পাহাড়ের দিকে। চায়ের পাতা না—টুকরি ভরে ভরে পাথর নিয়ে আসছে মেয়েরা। স্তূপ দিয়ে রাখছে কুলি লাইনের সামনে। হেরে যেতে হবে জানে—তবু।

পাথরের চাঙ হাতে নিয়ে নিশ্চিত পদক্ষেপে টহল দিয়ে চলেছে আরণ্যক মানুষ।

ভুটান পাহাড়ের কর্কশ নীল কুঁজে ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আসে রাইফেল ফায়ারের শব্দ। শুকরা থমকে দাঁড়ায়—

কি হল বাগানটায় ?

'গোলি কা আওয়াজ !' মেয়েটা বলে।

একটু ইতস্তত করে শুকরা তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে—

'কি হল বাগানটায়…'

ড্রেসিং টেবিল

সলিল চৌধুরী

বিয়ের পর নন্দা আমাকে যত চিঠি লিখত তার প্রায় প্রত্যেকটাতেই শেষে পুঃ দিয়ে অঁাকাবাঁকা অক্ষরে লেখা থাকত ঃ 'ঘর যখন নেবে আমার জন্যে একটা ড্রেসিং টেবিল কিনতে ভুলো না—আর আয়নাটা যেন খুব বড় আর ভালো হয়।'

বিয়ের আগে নন্দার বাড়ি যখন যেতুম প্রথমেই নজরে পড়ত দরজার সামনের দেওয়ালে একখানি চটা-ওঠা আয়না। তাতে মুখ দেখলে—ওঃ যা দেখাত, নাক থেকে কপাল পর্যন্ত পুরো এক হাত লম্বা, আর ঠোঁট থেকে চিবুক মাত্তর এক ইঞ্চি! আবার একটু নড়লে চড়লেই আয়নাটা নানারকম ভঙ্গি করে মুখ ভ্যাঙাত।

রীতিমত মন খারাপ হয়ে যেত আমার, আর নন্দা হাসত, বলতো, 'তোমার কাছে যখন যাব, তখন ভালো আয়না কিনে দিও।'

পরবর্তী জীবনে নানা সমালোচকের সম্মুখীন হতে হয়েছে—তাঁদের সমালোচনায় নিজের প্রতিবিম্বও দেখেছি,—দেখে বেশির ভাগ সময়েই মনে পড়েছে নন্দার বাড়ির সেই আয়নাটার কথা। সে কথা থাক—

বিয়ের ঠিক পরে। তখন আমার দু-তিনটে খবরের কাগজে ভালো চাকরি পাওয়ার কথা হচ্ছে। মানে এই হল বলে আর কি! সেটা না হওয়া পর্যন্ত কটা দিন নন্দা তার বাবার কাছে থাকবে—ঠিক হল। আর চাকরি হলেই ঘরভাড়া নিয়ে নন্দাকে কলকাতায় নিয়ে আসব। কেমন করে ঘর সাজানো হবে কোন্ জায়গায় কি থাকবে—সে সব প্ল্যান দুজনে মিলে আলোচনা করে পুরোপুরি মাথায় নিয়ে কলকাতায় এসে হাজির হলুম। নন্দা রইল গ্রামে তার বাবার কাছে। এর পরে ছ-মাসের কাহিনী যদি আপনারা শোনেন—থাকগে—সে সব বলে লাভ নেই কারণ যে কাহিনী বলতে বসেছি সেটা আমার নিজের কথা নয়। তবু বলে রাখা ভালো যে, চাকরি আমি পেয়েছি। নয়তো অনেকে মনে করতে পারেন যে বেকার সমস্যার ওপর আমি কটাক্ষ

করছি। অবশ্য যে চাকরিগুলো পাবার কথা ছিল তার একটিও পাইনি কিন্তু এমন একটা পেয়েছি যা ঘুণাক্ষরে মনের ত্রিসীমানাতেও কোনদিন ঠাঁই পায়নি। এক কথায় জুতোর দোকানের সেলস্‌ম্যান। আর কসবার একেবারে ভেতর দিকে যে এঁদো পুকুরগুলো আছে তারই একটার পাড়ে দু-খানা টিন-দেওয়া ঘর এক মামাতো ভায়ের সঙ্গে বখরা করে ভাড়া নিয়েছি। নন্দাও চলে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে—মানে বেশ আছি। নন্দার একটা আশ্চর্য প্রতিভা আছে, বোধহয় সব মেয়েরই ওটা থাকে, সেটা হচ্ছে অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। একদিনের জন্যেও মুখ শুকনো দেখিনি নন্দার, যেন কসবার টিনের ঘর ভাড়া নেওয়াটাই তার আজীবনের স্বপ্ন। কিন্তু একটা ব্যাপার, এ ঘরে আসার পর থেকে একবারের জন্যেও নন্দা বলেনি ড্রেসিং টেবিলের কথা। আমিও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম এমন সময় এক শনিবারের দুপুরবেলা একটা ঘটনা ঘটল। নগদ করকরে ষাট টাকা মাইনে গুনে নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরছি পথের দু-দিকে চাইতে চাইতে। ইচ্ছে করলেই কত কী কিনতে পারি অথচ কিছুই কিনছি না, এটা যেন আমার একটা সম্রাটিক খেয়াল। বেশ ভালো লাগে পকেটে টাকা থাকলে। হঠাৎ ঠিক কসবার মোড়ে দেখি এক চমৎকার ড্রেসিং টেবিল—রাস্তায় নীলেমে বিক্রি হচ্ছে। আরো কত কি ফার্নিচার আশ্চর্য সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। ড্রেসিং টেবিলের গ্লাসের একটা কোণ কেবল একটু ফাটা তাছাড়া প্রায় নিখুঁত। দাম উঠল তিরিশ টাকা, ভাবুন! হুপের মাথায় যা থাকে বরাতে বলে কিনে ফেলে মুটের মাথায় চাপিয়ে সটান বাড়ির দিকে পা বাড়ালুম। বাড়িভাড়া যাবে ১৫ টাকা, বাকি ১৫টি টাকায় সারা মাস সংসার চালাতে হবে। নন্দার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল—কত আশা কত স্বপ্ন বুকে নিয়ে বেচারী ভালবাসতে শুরু করেছিল তার তো কিছুই মিটল না! তিরিশ টাকা যায় যাক কুছ পরোয়া নেই।

বাড়ি ঢুকতেই নন্দা প্রথমটা অবাক হয়ে গেল, তারপর কি যেন ভেবে কী ভীষণ খুশি যে হয়ে উঠল কি বলব। অন্য মেয়ে হলে হয়তো টাকার হিসেব করে এতক্ষণ প্যান্ প্যান্ করতে বসত, কিন্তু দরিয়ার মত দিল আছে নন্দার। কবি না হোক কবি-স্ত্রী হবার নিশ্চয় উপযুক্ত। প্রায় সারাক্ষণ নন্দা আয়নার সামনেই বসে কাটালো, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চুল বাঁধল, কাপড় ছেড়ে কপালে টিপ

পরলো, মাথায় ঘোমটা টেনে অকারণে দু-একবার হাসলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে খুশিতে যেন আবেশ আসছে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। বিয়ের আগের দিনগুলো স্বপ্নে ভাসছে, কেমন যেন সার্থক মনে হচ্ছে জীবন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, নন্দা ডাকছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম, নন্দার দু-চোখ ফুলে লাল হয়ে উঠেছে, চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে, সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'কী হয়েছে নন্দা? তুমি কাঁদছো কেন অত?'

'ও আয়না তুমি ফেরত দিয়ে এস, ও আমার চাই না।' বালিশে মুখ ঢেকে নন্দা কাঁদতে লাগল। হয়তো পুরনো জিনিস বুঝতে পেরে ওর অপমান হয়েছে। কিন্তু নতুনের দাম কত। সে কি আমাদের কেনার সাধ্যি! এত অবুঝ হলে কেমন করে চলবে? আর জিনিসটা তো প্রায় নতুনই বলা যেতে পারে।

'ছি! নন্দা শোন।'

'না, না, না, আমার চাই না। তুমি ফেরত দিয়ে এস।' স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কেবল সংকীর্ণ একটা প্রেসটিজ বড় হল নন্দার। আর আমার কোন দামই নেই ওর কাছে?

'বেশ। তাই হবে। ফেরত দিয়ে আসব।'

নন্দা আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল, খানিক পরে ফিরে এল আবার। আমার কোলের ওপর এক তাড়া চিঠি ফেলে দিয়ে বলল, 'এইগুলো পড়ে দেখ।'

নীল খামে মোড়া পরিষ্কার বাংলায় লেখা চারখানা চিঠি।

'কার চিঠি এগুলো? কোথায় ছিল?'

'আয়নার দেরাজের মধ্যে ছিল।'

চিঠিগুলো নিয়ে বসলুম। খুলে পড়তে শুরু করলুম একখানা করে, হাত কাঁপছে, কি ব্যাপার কে জানে? তারিখ হিসেবে পর পর সাজালে চিঠিগুলো এই:

সলিল চৌধুরী

(১)

বাগেরহাট

প্রিয়তমাসু—

আজ রাত বারোটায় এখানে এসে পৌঁচেছি। মনে হচ্ছে কতদিন যেন ছেড়ে এসেছি তোমাকে। ভাবতে অবাক লাগছে কাল এতক্ষণে তুমি কত কাছটিতে ছিলে।.........

জায়গাটা শহর থেকে কিছুটা দূরে। অমলের কথা মনে আছে তো? সে এখানকার কলেজে প্রফেসারি করছে। কাল থেকে তার ওখানেই উঠব। শরীর বড় ক্লান্ত লাগছে—অবশ্য ট্রেনে বিশেষ কষ্ট হয়নি। ট্রেনে একটা বড় মজার ব্যাপার হয়েছে শোন: আমার সামনের বেঞ্চেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে আমার সহযাত্রী। সুন্দর ঝক্‌ঝকে একটি পরিবার, ছেলেমেয়ের নিটোল স্বাস্থ্য, প্রৌঢ়ের অমায়িক হাসিমুখ আর খাঁটি বাংলার মা, ভীষণ ভালো লাগছিল। স্কেচ বইটা বের করে মনে রাখার মত করে সাজিয়ে নিচ্ছিলাম। একটি মেয়ের নজরে পড়ল যে আমি ছবি আঁকছি, সে তার বোনকে বললো, বোন মাকে বললো, মা বাবাকে বললেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভীষণ উৎসাহে একেবারে ফেটে পড়লেন। 'তাই নাকি? দেখি কেমন আঁকলেন আমাদের? আরে! এমন অদ্ভুত মশাই। একেবারে জাদুকর লোক দেখছি আপনি?' তারপর মহা হৈ চৈ! যাই কেনেন তাই খেতে দেন আমাকে, কিছুতেই ছাড়বেন না। 'আরে মশাই, বাঙালীর এত দুর্দশা কেন জানেন? তারা শিল্পীর কদর জানে না। আমারও ওসব শখ ছিল, এককালে নামও ছিল গাইয়ে বাজিয়ে মহলে। নিন ধরুন—লজ্জা কিসের?'

খেতে হল। ভদ্রলোক যখন কথা বলেন উত্তরের প্রত্যাশা করেন না, মনের ভাবটা যেন এই যে তার ওপরে আর কোন কথাই চলতে পারে না।

'বিয়ে থা করেননি তো? বেশ, বেশ! ঐটি যেন করবেন না। এই দেখুন না আমার—হেঁ হেঁ—সব চুলোয় যাবে তাহলে'—

আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম আমি বিয়ে করেছি—ভদ্রলোক মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন—

'আমার মেয়েদের ছবি আঁকা শেখান না আপনি ? যা লাগে দেব। কলকাতায়ই তো থাকেন—আমার বাড়ি হচ্ছে বিডন স্ট্রীট। আসবেন নিশ্চয়। যাক তাহলে ঐ কথাই রইল। হাসি, খুশি! তোমরা খুশি তো ? দেখ কেমন মাস্টার পেয়ে গেলে—হেঁ—হেঁ—হেঁ।'

কোন কথার উত্তর দেবার অবকাশ নেই আমার। বোন দুটি জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি আসবেন তো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আসব।'—উপায় নেই।

ইতিমধ্যে ছোট ভাইটি আমার ব্যাগ হাতড়ে অ্যালবামটা টেনে বের করেছে—আঙুলে থুতু লাগিয়ে ছবি উলটে দেখছে।

মা বললেন, 'ছি খোকা, অসভ্যতা কোর না, রেখে দাও!'

'না মা! মাস্টারমশাই আমাকে দেখতে বলেছেন, বলুন না আপনি বলেননি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওকে দেখতে বলেছি।' উপায় নেই এরা সব এক জাতের। ভদ্রলোক রানাঘাটে নেমে যাবেন। তোমার তৈরি লুচি বের করলুম—

'খেতেই হবে।' খোকাকে দিলুম, বোনেদের দিলুম। নানা কথা হল—দেশের স্বাস্থ্য, টেনান্সি অ্যাক্ট, কমনওয়েলথ—তারপর তাঁরা নেমে গেলেন। গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন: 'আরে ভালো কথা, আপনার নাম ঠিকানাটা তো জানা হল না। বলুন বলুন'—তিনি কাগজ কলম বের করলেন। একবার বললুম—শুনতে পেলেন না—আবার বললুম—'রহিমুদ্দিন চৌধুরী।'

'অ্যাঁ ?'

'রহিমুদ্দিন চৌধুরী।'

'অ'

লিখে নিলেন কিন্তু হাত কাঁপলো। ঢোঁক গিলে বললেন: 'তা বেশ বেশ। কিন্তু ধরার উপায় নেই, দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালী—তাই নয় গো ?'

দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালী—তাই নয় গো ? আমি চেঁচিয়ে বলতে

চাইলাম, 'এখন কি বুঝলেন তবে পাঞ্জাবী ?' কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হল না। আবহাওয়াটা সহজ করার জন্যে বোন দুটি তেমনি হেসে বলল—

'ভুলে যাবেন না, আসবেন ঠিক—বিডন স্ট্রীট'। হাসবার চেষ্টা করলুম। গাড়ি ছেড়ে দিল। দেখতে পেলাম খোকার হাত থেকে মা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন খাবারটা। তোমার হাতের তৈরি সেই খাবারের টুকরোটা প্লাটফর্মে পড়ে রইল। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল—মনে হল কামরা শুদ্ধ লোককে ডেকে বলি : 'দেখ তোমরা, কত বড় অবিচার হল দেখ।' কেউ কিছু জানল না। আমি চুপচাপ বসে রইলাম—সমস্ত দিনটাই আমার মাটি।

সব কথা এখন আর মনে নেই—মনে রাখতেও চাইনে। মাঝে মাঝে বোন দুটির কথা কানে ভাসছে : 'ভুলে যাবেন না—আসবেন ঠিক—বিডন স্ট্রীট।' মনে মনে বলি :

'না তোমাদের ভুলবো না বোন—তোমরাই নতুন বাংলা—তোমাদের মুখ চেয়েই যে আমরা বেঁচে আছি—তোমাদের ভুলবো না।'

চিঠির উত্তর দিও...

তোমার রহিম

খামের ওপর ঠিকানা লেখা : আমিনা চৌধুরী, উজানীপাড়া, হাওড়া।

(২)

বৌ— বাগেরহাট

আজ সকালে অমলের বাসায় এসে উঠেছি। পথে আসতে দেখছি বহু লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছে, থম থম করছে সমস্ত শহরটা—লোকে জোরে কথা পর্যন্ত বলছে না। বুঝতেই পারছ হঠাৎ একেবারে এর মাঝখানে এসে পড়ে হতভম্ব হয়ে গেছি। ব্যাপারটা ভালো করে বোধগম্য হওয়ার আগেই শুনি অমল চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে—মালপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। দু-একদিনের মধ্যেই ওরা পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় রওনা হবে। আমাকে ওরা আশা করেনি—

অমলের বৌ একটু ফিকে হাসল।

'ব্যাপার কি অমল ? কি খবর বৌদি ? তোমরাও শেষকালে চললে ?' বৌদি হাসবার চেষ্টা করল, 'তোমাদের দেশে তো আর আমাদের জায়গা হবে না ঠাকুরপো !'

'আমাদের দেশ ? আমাদের দেশ মানে ? খুলনা তো অমলের দেশ— আমার দেশ ২৪ পরগনা—যাচ্ছ তো আমার দেশেই শুনছি।'

'আজকাল আর তা নয়—এখন মোছলমানের দেশ পাকিস্তান আর হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থান।' অমল বলল বৌদিকে : 'তুমি যা করছিলে তাই কর গিয়ে।' জিনিসপত্র গোছাতে বৌদি চলে গেল। চুপচাপ অমলের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। অমলের বাচ্চাটা নতুন হামা দিতে শিখেছে—ফুট ফুট করছে সুন্দর—সামনের দুটো দাঁত উঠেছে। সে তার বাপের পা ধরে দাঁড়াতে গিয়ে ধপ করে পড়ে কেঁদে উঠল। অমলের ভ্রূক্ষেপ নেই।

'শোন রহিম, কথা আছে তোর সঙ্গে।'

'বল্, শুনছি।' বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলুম। অমলের কাছে যা কথা শুনেছি তার মোট কথাগুলো তোমাকে জানাচ্ছি ; শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে নমঃশূদ্রদের গ্রামে একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেছে। নমঃশূদ্ররা বেশির ভাগই চাষী—নয়তো জেলে। স্বভাবতই তারা খুব গরিব। কিছুদিন ধরে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা সবাই একজোট হচ্ছিল। তাদের দুজন নেতাকে ধরবার জন্যে পুলিশ ওয়ারেন্ট বের করে। নেতাদের মধ্যে একজন হিন্দু একজন মুসলমান। তাদের ধরার জন্যে গ্রামে যখন একদল পুলিস ঢোকে চাষীরা তাদের বলে ফিরে যেতে। তাতে কাজ না হওয়ায় কিছুটা উত্তম মধ্যম দিয়ে তারা তাদের বের করে দেয় গ্রাম থেকে। এর পরেই ঘটনার শুরু। বহু আর্মড পুলিশ আর বে-সরকারী গুণ্ডা বাহিনী গিয়ে হাজির হয় গ্রামে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে শুরু হয় প্রচণ্ড অত্যাচার। গ্রামকে গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দেয়—আর যা পায় লুট করে নিয়ে আসে। সমস্ত মানুষ গাঁ ছেড়ে পালাতে শুরু করে—আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে। এদিকে জোর প্রচার চলতে থাকে যে হিন্দুরা হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু—ওদের তাড়াও। এই সুযোগে শহরে গুণ্ডারা হিন্দুদের কয়েকটা দোকান লুটপাট করে—আগুন দেয়। সদর রাস্তায় ওরা শাসাতে থাকে হিন্দুদের। আনোয়ারকে তোমাকে মনে আছে ? সেই যে স্কাউণ্ড্রেলটা কলেজে একদিন তোমাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছিল ? শুনেছিলাম একজনের সঙ্গে শেয়ারের বিজনেস করার নাম করে তার যথাসর্বস্ব মেরে দিয়ে পাকিস্তানে চলে এসেছে।

এখন শুনি সেই নাকি এখানকার গুণ্ডাবাহিনীর মস্ত বড় কর্তা। তিনিই নাকি লীড করেছেন !

শুনে পর্যন্ত রক্ত টগবগ করে ফুটছে। রাসকেলটার যদি একবার দেখা পাই তো ওর টুঁটি আমি ছিঁড়ে ফেল দেব, এ তুমি দেখে নিও। অমলরা চলে যাচ্ছে, কাল না গেলে পরশু যাবে—নয়তো তার পরদিন। কি বলব ওদের বলতো ? লজ্জায় দুঃখে আমার বুকটা খান খান হয়ে যাচ্ছে। কি যেন আমার একটা করা উচিত বুঝতে পারছি না। অমলের দেশ ছেড়ে যদি অমলকে চলে যেতে হয়, আমার দেশকেই বা আঁকড়ে থাকব কোন্ যুক্তিতে ? ভাবতে খারাপ লাগছে বড়। এখানে বিশেষ কাউকে চিনি না। একটি পরিচিত ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে—তারা পিস কমিটি করছে বললো। সব কাজকর্ম এখানে প্রায় বন্ধ। ভাবছি কাল পরশু নাগাদ ঢাকা চলে যাব। সেখানে শুনেছি কিছু কিছু কাজ পাবার সম্ভাবনা আছে। অন্য কিছুই ভেবো না। আজকের দিনে মানুষকে আর সহজে বেশি দিন বিভ্রান্ত করে রাখা যায় না। মনুষ্যত্ব জয়ী হবেই—এই আশাতেই বুক বাঁধতে হবে। ওখানকার পরিচিতদের কাছে এখানকার সঠিক খবরটা দিও.........

তোমার রহিম

(৩)

বৌ— ঢাকা

তোমার চিঠি পেয়ে আরো ভাবনা বাড়ল। কলকাতার কাগজগুলো খুলনার ব্যাপারকে যদি এইভাবে প্রচার করতে শুরু করে থাকে তাহলে তার সাংঘাতিক ফল ফলবে। যে পয়সা লাভের আশায় ওরা দানবকে জাগিয়ে তুলেছে সেই দানবই ওদের ধ্বংস করবে। তবে ওরা বোধহয় নিশ্চিত যে, সময় বুঝে দাঙ্গা বাধানো বা থামানো এটা ওদেরই হাতে। এখানকার কাগজগুলোও ঠিক তাই শুরু করেছে। পরস্পরের ওপর সন্দেহ আর অবিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে, কখন কি ঘটে সেই আশঙ্কায় সবার চোখেমুখে বিষণ্ণতা দেখছি, এমন যদি কোন শক্তি থাকত যা এই সমস্ত নোংরামিকে পায়ে মাড়িয়ে মনুষ্যত্বের ধ্বজাকে উঁচুতে তুলে ধরবে। শুধু আমি নয় প্রায় সবাই মনে প্রাণে এই কথাটি অনুভব করছে—কিন্তু সে কই ? এখানে সরকারী মহলে কিছু কাজের আশায় ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। আমি যে

বাঙালী এই কথাটাই প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। তুমি তো জান আমি পয়সা খরচ করে উর্দু ভাষা শিখেছিলুম। উর্দু সাহিত্যকে আমি ভালবাসি কিন্তু যখন সেটা শাসনের দণ্ড হয়ে সোজা ঘাড়ের উপর পড়তে চায়, আমার সংস্কৃতির টুঁটি টিপে ধরে তখন তাকে বর্জন করাই মানুষের কাজ। সকলের কথায় সোজা বাংলায় উত্তর দিই—বুঝলো ভালো না বোঝে পরোয়া নেই। কাজেই কাজ যে জুটবে না বেশি তা বোধহয় বুঝতে পার।

তোমার রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে জেনে ভারি কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে দেখে যারা কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আমি অন্তত বিশ্বাস করি তাদের রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখবার কোন অধিকার নেই। কিন্তু এ বিশ্বাস হারিও না যে—এরা সবাই ভালো—এদের বাদ দিয়ে একা তুমি যাবে কোথায়? দুর্ভাগ্য দেশের, তার অভিশাপ এখনো কাটেনি, সে দুর্ভাগ্য থেকে তুমি আমি বাদ যাব কেমন করে বল বৌ! মনুষ্যত্বের অপমান যখন দেখি—মনে হয় আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে খাক করে করে দিই এই হতভাগা দেশের পচা আবর্জনাগুলোকে।

সেদিন শুনলুম কয়েকটা চ্যাংড়া ছোঁড়া মিলে সদর রাস্তার ওপরে এখানকার কলেজের পণ্ডিতমশাইকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে—টিকি কেটে দিয়েছে, মুখে গোমাংস দিয়েছে জোর করে। ভাবতে পার? আমি শুনে এখানকার মাতব্বরদের বললুম: 'আপনারা থাকতে চোখের সামনে এই সব ঘটছে—আপনারা কি ঠিক জানেন যে আপনারা এখনো বেঁচে আছেন?' তারা বললেন: কী করব--ওদের হাতে বন্দুক আছে পেছনে পুলিস আছে। ওরা হুমকি দিয়েছে—যে কেউ ওদের বাধা দেবে তারাই পাকিস্তানের শত্রু, তাদের ঘরদোর ওরা জ্বালিয়ে দেবে, তাদের খুন করবে—ইত্যাদি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় গোটা জাতটারই শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, নইলে কটা আগাছাকে উপড়ে ফেলা যায় না? আগাছাই বোধহয় জন্মাচ্ছে বেশি—বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও স্বীকার করতে হবে।

এখানে আর মোটে ভালো লাগছে না বৌ। এবারে এসেই বোধহয় ভুল করেছি—তোমাকে ছেড়ে আর এক দণ্ডও থাকতে পারছি না বৌ। ……কাজকর্ম চুলোয় যাক, দু-একদিনের মধ্যেই পাড়ি দেব। অমলের চিঠি পেয়েছি—ওরা আগামীকাল রওনা হবে। কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে

দেখা করবে লিখছে। ওখানেই ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিও। কোনরকমে চলে যাবেই।

তোমার রহিম

(এর পরের চিঠিটা প্রায় কুড়ি দিন পরে লেখা। মনে হয় এর আগে আরো চিঠি লিখেছিলেন—যে কোন কারণেই হোক সেটা নেই।)

(৪)

আমিনা—

আমি বোধহয় শিগগিরই পাগল হয়ে যাব। গত সাত দিন ধরে এক সেকেণ্ডের জন্যেও ঘুমোতে পারিনি। পাগলের মত সারা শহরে ঘুরে বেড়িয়েছি। মনে হচ্ছে মনুষ্যত্ব শেষ হয়ে গেছে—বীভৎস তাণ্ডব চল্‌ছে পশুত্বের। চারিদিকে চিৎকার, কান্না আর পৈশাচিক উল্লাস। তার ওপর আজ আট দিন তোমার কোন চিঠিপত্র নেই। হাজার হাজার রিফিউজি এসে জড়ো হচ্ছে। তারা বলছে কলকাতায় আর একজন মুসলমানও বেঁচে নেই। বিশ্বাস করা উচিত কি না সে বিচারের বুদ্ধিও আমার লোপ পেয়ে গেছে। তুমি কোথায় আছ? তুমি এখনও আছ তো? একথা আজ আর কোন মানুষকে জিজ্ঞেস করি না—জিজ্ঞেস করি সূর্যকে, জিজ্ঞেস করি গাছপালাকে। জিজ্ঞেস করি, আমার আমিনা কেমন আছে, কোথায় আছে?

অমলের একখানা চিঠি এসেছে। বর্ডার থেকে ওদের মারধোর করে সমস্ত লুটপাট করে নিয়েছে। বৌদিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে—অমল কোন রকমে বাচ্চাটাকে নিয়ে রানাঘাটে পৌঁচেছে। অমল লিখেছে—'আমার অবস্থার কথা না লেখাই ভালো, তবে এটুকু জ্ঞান এখনো আছে যে এ খবর কলকাতার কাগজওয়ালাদের হাতে পড়া উচিত নয়। যা ভালো হয় করিস। আমি দেহমনে সম্পূর্ণ অথর্ব হয়ে গেছি।'

আমি এখনই বেরিয়ে পড়ছি। এখানে আর কয়েক ঘণ্টা থাকলে বোধহয় আত্মহত্যা করে বসব। বৌদিকে খুঁজে বের করতেই হবে। তোমার খবর পেলে মনে অনেকটা জোর পেতুম। জানি না আবার কবে তোমাকে দেখব—জানি না দেখব কিনা।

আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা কর। বড় অহংকার ছিল আমার দেশকে আমি চিনে ফেলেছি—সে অহংকারও চূর্ণ হয়েছে। মনুষ্যত্বকে বড় করতে গিয়ে

পশুত্বকে ছোট করে দেখেছি—তাই পশুর প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। যেখানেই থাক, যেমন থাক—সাবধানে থেক। তোমাকে আমি হারাতে পারব না বৌ, অমলের মহত্ত্ব আমার আছে কিনা সে পরীক্ষা আমি দিতে পারব না। আমি সাধারণ মানুষ।.........

তোমার রহিম

চিঠি এই কটাই। পড়ার পর হাওড়ার উজানীপাড়ায় গিয়ে খোঁজ করেছি শিল্পী রহিমুদ্দিনের বাড়ি কোনটা। কেউ বলেছে—'জানি না' কেউ বলেছে —'এ পাড়ায় কোন নেড়ে ফেড়ে আর নেই মশাই।' একজন পানওয়ালা শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে দিল একটা একতলা বাড়ি—তার দুখানা ঘর নিয়ে ওরা থাকত। বাড়িটার শোচনীয় অবস্থা। দরজা জানলার একটাও কপাট নেই—মাঝখানে কেবল একটা চট ঝুলছে। ডাকাডাকি করলে কেউ সাড়া দেয় না। শেষ পর্যন্ত চট সরিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখি অন্তত বিশজন মেয়েছেলে বাচ্চা কাচ্চা শুদ্ধ কেউ বসে কেউ শুয়ে রয়েছে। আমাকে ঢুকতে দেখে সবাই যেন চমকে উঠল। বাড়িটার চেয়েও তাদের অবস্থা খারাপ। জিজ্ঞেস করলুম ঃ' রহিমুদ্দিন চৌধুরী এখানে থাকেন ?'

তারা কেউ নামও শোনেনি রহিমুদ্দিনের—সেইদিন সকালে খালি ঘর পেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে—পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু সব। শুনলাম এরি মধ্যে চারবার হুমকি দেওয়া হয়েছে—রাত্রের মধ্যে উঠে যেতে হবে। একটি মধ্যবয়সী মহিলা ঘরের এককোণে বসে বমি করতে শুরু করলেন, সবাই নির্বিকার। এক ধামা খই মুড়কি নিয়ে দুটি ছেলে ঢুকল—দেখে মনে হল স্কুলের ছাত্র। তারাই ওদের এবাড়িতে জোর করে জায়গা করে দিয়েছে—দেখা শোনা করছে। তাদের জিজ্ঞেস করলুম। একজন চিনত রহিমুদ্দিনকে, আমিনা-কেও চিনত। তার দিদি রহিমুদ্দিনের কাছে ছবি আঁকা শিখতে আসত—সেও আসত দিদির সঙ্গে। তার কাছেই সব খবর পেলুম। বলল ঃ মাস্টার-মশাই শুনেছি পাকিস্তানে আছে—কিন্তু আমিনাদিদি বোধহয় বেঁচে নেই। একদিন রাতদুপুরে এই ঘরটার শিকল বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি আগুন নিবিয়ে ওদের উদ্ধার করতে—কিন্তু পারিনি—তখন ভীষণ গুলি চলছিল।' ছেলেটার চোখ ছলছল করতে থাকে। বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলুম—সমস্ত দেয়ালগুলো

পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে—পাশেই একটা নিম গাছ ঝলসে কুঁকড়ে গেছে। আগুন লেগেছিল সত্যিই। নন্দাকে ব্যাপারটা বলিনি—কেননা একটা সন্দেহ আমার হয়েছে—আমিনা যদি পুড়েই মরে থাকে—ড্রেসিং টেবিলটা অক্ষত রইল কি করে? ছাত্রটি বলেছিল: টেবিলটা ছিল পাশের ছোট ঘরটায়। —হয়তো আমিনাও সে ঘরে ছিল? কিন্তু সে গেল কোথায়?

নন্দার বিশ্বাস কাগজে খবরটা বেরুলেই আমিনা এসে নিয়ে যাবে •তার ড্রেসিং টেবিলটা—তাই এ কাহিনী লেখা। আয়নাটা নন্দা কাপড় দিয়ে মুড়ে রেখে দিয়েছে।

কাহিনীর এইখানেই শেষ। প্রসঙ্গত একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই পাঠক-পাঠিকার কাছে। হয়তো তার সঙ্গে এই কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই—কিন্তু সাদৃশ্য রয়েছে। গত ১লা এপ্রিলের একটি বাংলা কাগজে এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছে: "হাওড়া স্টেশনের নিকট গতকাল এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়া পুলিস গ্রেপ্তার করে। তাহার কাছে ব্যাগের মধ্যে কয়েকটি তুলি ও কিছু স্কেচ ছবি পাওয়া গিয়াছে। সন্দেহ হয় সে হাওড়া স্টেশন ও পুলের প্ল্যান আঁকিয়া নিতেছিল। নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে পাগলের ভান করে ও বলে: 'একজন মানুষ।'

খবরের হেড লাইনে লেখা—**"পাকিস্তানের গুপ্তচর গ্রেপ্তার।"**

সড়ক

ঋত্বিককুমার ঘটক

মাঝখানে রাস্তা, দু-পাশে ফুটপাথ। রাস্তার কালো পীচের মসৃণ সুডৌল পিঠ, তার ওপর ঝলসাচ্ছে সূর্যের আলো। গাছের পাতায় ছায়ারা জাফরি কেটেছে সারা পথময়। বেলা দুপুর। ভাঙা বাড়িগুলোর সামনে ফুটপাথের কোল ঘেঁষে দু-পাশেই দুটো বড় বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ। প্রকাণ্ড গাছ দুটো দু-ধার থেকে এসে পরম স্নেহের আলিঙ্গনে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে। বিশাল একটা তোরণ তৈরি হয়েছে। আগুনের ছোপ-ধরা, কচি পাতার চোখজুড়োনো সবুজে ভরা তোরণটা হাওয়ার ইশারায় নাচে। তারি সঙ্গে ছন্দ জাগছে সারা পথের আলো-আঁধারির জাফরিতে। সর্ সর্ সর্ সর্ করে ভারী মিষ্টি একটা শব্দ হয়।...সহনশীল পিঠ পেতে রাজপথ পড়ে আছে চুপ করে।

ওপাশের ফুটে কালি-লাগা, ধ্বসে-পড়া, হা-হা-করা ফাঁকা বাড়ি—দোকানঘর, ঐতিহ্য চুরমার হয়ে যাওয়া ভগ্নস্তূপ সব। অপরিচিত একটা বস্তি ছিল ওখানে। রাস্তাটা একদম ফাঁকা, মাঝে মাঝে শুধু অস্ফুট শব্দ শোনা যায় কাদের। ঐ নিঃস্বতার পটভূমিতে থেকে থেকে মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বর পাত্‌লা হাওয়ায় ছোট হয়ে কানে এসে লাগে।

আজ যখন হঠাৎ দুপুরে ছুটি মিলে গেল, তখন কেন যে আমরা দুজনা এইখানে এই ফুটের ধারে এসে বসলাম, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমার বন্ধু একেবারে চুপ হয়ে পাশে বসে আছে। আমি যখন বললাম,—ঐ বস্তিরই একটা ঘরে থাকত আমাদের পরমপ্রিয় ইসরাইল, এতদূর যখন এলাম তখন চল দেখে আসি তার অবস্থাখানা এখন কী,—ও ভয়ানক চটে উঠল। আমি বলে অত্যন্ত বাজে বকি।

আমি বুঝি। আমার বন্ধুকে আমি জানি। ঐ নরম মনের জন্যেই তার মাথায় চেপে এসেছে দুঃখের ভার। সীমান্ত পার হয়ে যারা দলে দলে চলে এসে আমাদের শহর আর তার আশপাশ ছেয়ে ফেলেছে, তাদের চোখের

জ্বলে আবার যে আমাদের দেশ-চাপা আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠছে, একথা তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। আমাদেরই চোখের সামনে আমরা যে দেখছি এ এক আগুন-ফসলের বীজধান বোনা চলেছে,—একথা বললেই ও চটে যায়।

আজ নিয়ে এল এই পথের ধারে। ইসরাইল থাকতে কতদিন এসেছি। তার ছেলে এমদাদ, কী ছেলে! বাচ্চাটার ছবি আঁকার কী দুরন্ত শখই না ছিল। আর সে শখের জোগানদার ছিল আমার বন্ধু। রঙিন খড়ি কিনে এনে দিত এমদাদকে, সেই ছেলে পরম উৎসাহে দেওয়াল এবং মেঝেতে দাগ কাটত তাই দিয়ে। এই নিয়ে কতবার মার খেয়েছে ইসরাইলের হাতে তার ঠিক ঠিকানা নেই। একবারতো আমার বন্ধুর সঙ্গেই কাজিয়া বেধে গেল প্রায়, এই সব কুকর্মের উৎসাহদাতা বলে।...কিন্তু হাত ছিল বটে ছেলেটির। হয়তো কত কী-ই হতে পারত, কে তোয়াক্কা রাখে।

চেনা সেই সব মুখগুলোকে কোথাও দেখছিনা। ইসরাইল তার পরিবার নিয়ে কোথায় ছিট্‌কে চলে গেছে খোঁজ রাখিনা। আজ দেখি, তাদের সবার ভেঙে যাওয়া ঘরে নতুন এক দল এসে উঠেছে। কারা যেন এদের এনে উঠিয়েছে। এদের রাগকে ভুল পথে চালিত করে সুবিধে যাদের, তারাই হবে। কিন্তু তারা জানেনা, এদের পেট বড় শিক্ষক। যত জ্বলে মরবে, তত এরা জ্বলার জন্যে তৈরি হবে।

কথাটা শুনে আমার বন্ধু একেবারে খেঁকিয়ে উঠল—এত বাজে বক মাইরি। তোমার কথা শুনে মনে হয়, তুমি বুঝি এদের দুঃখে খুশি হয়েছ! যে তোমাকে জানে না, সে ঠিক তাই ভাববে।

এর উদ্ভট পাগলামির সঙ্গে তাল রেখে আর কত চলব? উঠতে যাচ্ছি একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল!

ইসরাইলকে দেখলাম। দুজনেই একসঙ্গে। স্বপ্নেও ভাবিনি ওকে ঠিক আজকেই এখানে পাওয়া যাবে। ও কিন্তু অবাকই হল না আমাদের দেখে, শুধু কাছে চলে এল। চোখের তলায় ওর কালি পড়েছে; চুলগুলো সোনালী মত হয়ে গেছে, আর অত বড় পাট্টা জোয়ানের গাল দুটো ভেঙে তুবড়ে গেছে। বস্তির ঘরগুলোর দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে। বন্ধু বলে—“কী, তুমি এখনো যাওনি?”

ইসরাইলের নজর কিন্তু সেই ঘরগুলোর দিকে গাঁথা। সে দাঁতের ভেতর থেকে জবাব দেয়—"ঐ ঘরটায় আমি থাকতাম। বুঝলে, ষোল বরস আমার ঐ ঘরে কেটেছে।"

আমার বন্ধু আবার বলে—"কী, যাওনি কেন?"

"এবার যাব। ভেবেছিলাম কোথায় যাব, সে দেশে কাউকে চিনি না। পার্ক সার্কাসে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার যাব।"

ও একটা নিশ্বাস আটকে চুপ করে থাকে খানিক। আমরা দুজনেই নীরব। মাথার ওপর গাছের পাতার ঝালর দোলে। ওপাশে দু-একটা লোক বস্তি থেকে বেরিয়ে যায় এক আধজন ঢোকে। ওদের মুখগুলো এক একটা ইতিহাস বুঝি।

আবার ইসরাইল কথা বলে—"আমার বেটাকে মনে আছে তোমাদের, এমদাদকে?"

আছে। এমদাদের সেই একগাদা চুল আর একগাদা দুষ্টুমি ভরা হাসি কী কখনও ভুলতে পারব?...একবার বন্ধুর দিকে তাকাই, সে মাটির দিকে মুখ করে ধুলোতে ঝরাকাঠি দিয়ে আঁচড় কাটছে। ইসরাইল বলে—"কাল রাতে সে খতম হয়েছে।...বুঝলে, আমার বেটা এমদাদ, তোমাদের দোস্ত—কাল রাত অনেক ঘড়িতে ওলাওঠা হয়ে মারা গেছে পার্ক সার্কাসের রিফিউজি ক্যাম্পে।"

চোখের কোণগুলো অল্প লালচে, সে চেয়ে আছে আমাদের দিকে।—"কেন মরল ও'বলতে পারো?...পারো না।"

কঠিন হয়ে খানিকক্ষণ সে আমাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁপে ওঠে। মুখটা নেমে যায়। আমার বন্ধু কী রকম যেন বিব্রত হয়ে পড়ে। অস্থিরভাবে বার কয়েক নড়ে বলে—"ইয়ে, ইসরাইল, তুমি ক-দিন, মানে—"

"খামোশ্!" ইসরাইল গর্জে ওঠে—"ওসব নাকী কান্নায় আমায় ভোলাতে পারবে না। কী ভেবেছ তোমরা আমাকে? জানো, আমি কে?"

বড় বড় চোখ করে খানিক আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে সে এক ঝটকায় ঘুরে যায়। দৃঢ়ভাবে কয় ধাপ এগিয়ে তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আবার। ...আমি কাছে গেলাম। পেছন থেকে বললাম—"তোমার খাওয়া হয়েছে? সারাদিন খেয়েছ কিছু?"

ধুলোবালি লাগা সোনালী চুল সমেত মাথাটা ঝাঁকায় সে। আবার বলি —"খাবে ?"

ও ঘুরল। টল্‌টল্‌ করছে চোখে জল !—"আমার মাথার মধ্যেটা কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে ওস্তাদ।"

গায়ে হাত দিলাম। হাতটাকে নামিয়ে ওর মুঠোর মধ্যে নিল। দু-বার চাপ দিল। তারপর আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সলজ্জ একটু হাসল। বৃষ্টিতে ধোয়া আকাশের মত হাসি।

* * *

মোড়ের হালুইকরের দোকানে বসে তিনজন খেয়ে নিলাম। যন্ত্রের মত ইসরাইল খেয়ে যাচ্ছে, একটা কথাও না বলে। আমার বন্ধু বারবার খাবারের গ্রাস হাতে করে ওকে দেখছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। খাওয়া শেষে ইসরাইল যখন হাত ধুতে উঠল, সন্ত্রস্ত হয়ে আমার বন্ধু চেয়ারটা সরিয়ে ওর যাবার জায়গা করে দেয়। মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষার একটা বিশ্রি শব্দ হয়। ইসরাইল উঠে দাঁড়ায়। আমাদের দুজনের দিকে অদ্ভুতভাবে দেখে। ঠোঁটটা অতি অল্প ফাঁক হয়ে যায়।—"দোস্ত!"

আমার বন্ধু যেন নিজের মনেই খুশি হয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে ইসরাইলকে একবার আদর করে নেয়।...আমরা পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সেই ফুটপাথ আর গাছের তোরণ। ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে গাছের পাতায় দোলানি একেবারে নেই। ভ্যাপসা গরম আকাশ তামাটে, সূক্ষ্ম ধোঁয়ার আবরণে যেন পোড়া আকাশটা ঢাকা।

কে একজন লোক ওধারে থামের ওপর কাত হয়ে শুয়ে আছে, তার পেছনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এধারে এসে বসার আগেই সে নির্লিপ্ত বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল—

"মনপবনের নাওরে, মনপবনের নাও,
রাঙ্গাবরন কন্যা যেথায় সেই দেশেতে যাও॥"

সুর শুনলেই আমার বন্ধুর মেজাজটা ভালো হয়ে যায়। আনন্দিত মনে বলে উঠল—"বাঙালদের এইটেই আমার ভালো লাগে। এত সুন্দর গান করে।"

ইসরাইল আবার কেমন গুম হয়ে গিয়েছিল। বস্তির ঘরগুলোর দিকে

তেমনি করে বারবার চাইছিল। এবার বলে বসে,—"দেখ বাবু, সত্যি কথা বলি। ঐ শালা আমার ঘর ছিল। ঐ ঘরে এতদিন কেটেছে। আজ কে এসে আমার সেই ঘরটাকে বেদখল করে বসে আছে। আচ্ছা বলত, রাগ হবেনা আমার? মনে হবেনা শালাদের শেষ করে ফেলি?···কিন্তু জানি, এখানে বিচার নেই। তাই পাকিস্তানে যাব।···এই ঘর, এই রাস্তা, এই তোমরা, আর এই সব,—ছেড়ে যেতে শিনা দুখাবে না? দুখাবে। কিন্তু ঘর আমার চাই। তাই যাই।"

আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করে—"কে আছেরে ওঘরে এখন?"

"কী জানি! তবে যেই থাক, তাকে ছিঁড়ে দু-টুকরো করতে পারলে তবে শান্তি। সে আমার দুশমন। গোটা দেশটাই দুশমন।"

আমার বন্ধু হঠাৎ বিজ্ঞের মত বলে—"কে যে দুশমন, সেইটেইতো কথা—"

ওদের গম্ভীর কথার ফাঁকে ফাঁকে অল্প বেসুরো গানটা টানা-টানা সুরে কান্নার মত ভেসে আসছিল, আমার বন্ধু কথা থামিয়ে চুপ করে শোনে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—"সত্যি, গানগুলো ভাল। মনটা উদাস মেরে যায় শুনলে।"

ইসরাইল হাঁটুতে চাপড় দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কোন কথা না বলেই কয় পা হেঁটে চলে যায়। ঘুরে আমরা তাকিয়ে আছি দেখে দাঁড়ায়। নিজের মনেই যেন কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়—"না, এমদাদ। তসবির খিঁচতে বড় দড় ছিল। মহা দড়। তো, সব ভেঙেচুরে নিয়ে গেছে, কিন্তু, দেওয়াল থেকে তার দস্তখত নিয়ে যেতে পারেনি। মাটির দেওয়ালে আঁকা তার নানীজানের ছবিটা। আর সেইবার যে মার দিয়েছিলাম আর একটা এঁকেছিল বলে, একটা রেলের গাড়ি এঁকেছিল, লাল আর সবুজ আর হলুদ খড়ি দিয়ে।··· তোমার তো ভারী দোস্ত ছিল।"

একটু হাঁ করে ও আমাদের দিকে চেয়ে আছে। চোখের কোলে সলজ্জ হাসির আভাস। আমার বন্ধু একটু একটু করে বলে—"এমদাদ ভালো ছবি আঁকত।"

ইসরাইলের মুখের ভাবটা ধীরে বদলে যায়। অন্যমনস্কভাবে শুধু চোখের মণি ঘুরিয়ে আমার বন্ধুর দিকে দেখে, তারপর তাকায় আবার বস্তিটার দিকে।

ওর চোখের মধ্যে স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাবনার ছায়া নেমে আসে। আমাদের অস্তিত্ব যেন ও ভুলে গেছে, ধীরে ঘুরে চলে গেল।

গাইয়ে লোকটা ওধারে গাছের ছায়ায় সটান শুয়ে পড়েছে, আর গান করছে না। সূর্য চলে এসেছে পশ্চিমে, বেলা গড়িয়ে দুপুর উৎরে যাচ্ছে।... আমি বললাম—"সে তো হল। কিন্তু এলাম কেন এখানে, বসেই বা আছি কেন, কিছুই বুঝছি না।"

আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে বন্ধু, তারপর উবু হয়ে বসে অল্প দুলতে দুলতে মাটিতে নখ দিয়ে নকশা কাটে। লেখে—"ইসরাইল—" ল-এর পর দাঁড়িটা জোরে কেটে নখ তুলে নেয়। তারপর বলে—"অনেক দিন পরে ইসরাইলকে দেখতে ভারী ইচ্ছে করছিল। তার পাড়াটা অন্তত। কতদিন এদিকে আসিনি বলত ?...নানান্ ধান্দায় ওর কথা একবারও মনে হয়নি।"

আমার বিশ্রি লাগতে থাকে। এভাবে বসে সারা দুপুরটা কাটানোর কোন মানেই পাচ্ছি না। মাথা ধরে যাবে ভ্যাপসা গরমে। হঠাৎ আমার বন্ধু আবার বলে—"একটা কথা ওস্তাদ।"

"বল।"

"ওর বেটা এমদাদকে তোমার কেমন লাগত ?"

"ভোলা যায় না। একদিন একটা বড় আঁকিয়ে হত।"

"হত, না ?" আমার বন্ধু প্রশ্নভরা চোখে আমার দিকে তাকায়।—"হত না।...ওকে বিড়ি বাঁধতে হত। কিংবা ঐরকমই একটা কিছু।"

..."আচ্ছা ওস্তাদ !" ঘাড়টা একটু হেলিয়ে ভুরু কুঁচকে আকাশের দিকে তাকায় ও।

"কী ? বল।"

"এমদাদ তো মরে গেল ! কফিনের মধ্যে করে ওকে কবরচাপা দেবে। একেবারে শেষ হয়ে গেল ছেলেটা। আর কিছু বাকি নেই ওর, না ?"

চুপ করে চেয়ে থাকি ওর দিকে। ও আবার বলে—"আর ও খড়ি চাইবেনা আমার কাছে। কারো কাছেই কিছু চাইবেনা। ওর চাহিদা ফুরিয়ে গেছে।...আচ্ছা, সবারই তো ফুরোবে। আমারও। কোন একদিন।"

"হ্যাঁ, তাতে কী ?" জিজ্ঞাসা করি ওর দিকে চেয়ে।

"না।... আমি ঐ গাইয়েটার কথা ভাবছিলাম। ঐ যে, গান করছিল এখানে বসে, শুয়ে আছে। ওর তো একটা চেনা পাড়া ছিলতো।...সেখানকার লোক আর ওর গান শুনবে না। এমন একটা দিন আসবে, যেদিন কেউ শুনবে না। ওর গানের কথার চাহিদাও চুকে যাবে।"

কী বলতে চায় ও, কিছুই বুঝতে পারি না। ও কিন্তু নিজের মনে বলে চলে—"তার মানে মরলেই সব চাহিদা চুকে যায়। পেটের, মাথার, সব কিছুর।...আচ্ছা, এই কথাটা যদি বলি, কেমন হয় ভেবে দেখত...চাহিদা মেটানোর ভার যাদের, তারা যদি মেটাতে না চায়, তবে তারা কী চাইবে? মরি, এই চাইবে। সবাই মিলে, সব ছবি আর সব গান নিয়ে মরে যাই। বালাই থাকবে না। কী বল!"

আমার বন্ধুর যুক্তিজাল খুব দামী সুতোয় গাঁথা, আমার তা মনে হলনা। চুপ করে চেয়ে রইলাম। ও বলল—"আজতো সবাই মরছি, মরবই। তার মানে, কেউ চাইছে আমরা মরি। কারা? যারা চাহিদা মেটাবে। কেমন কিনা! এই কথাটা—আরে!"

চমকে তাকালাম ওর কথা শুনে। আকাশটাকে দেখছে ও দাঁড়িয়ে উঠে—আমিও চাইলাম। পশ্চিমের এক কোণে অল্প অল্প কালো মেঘ চুপচাপ হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। নজর তার সূক্ষ্ম ধোঁয়ায় ভরা তামাটে সারা আকাশের দিকে। থেকে থেকে তার পাঁজর ঘেঁসে সাদা হয়ে উঠছে, বাজের আলো। দূর থেকে চাপা গমগমে আওয়াজ ভেসে আসছে, লাফ দিয়ে পড়ার আগেকার বাঘের ডাকের মত। ঐ দিকে তাকিয়েই আমার যেন চোখ জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। স্নিগ্ধ বৃষ্টির নিশানা আসছে।...

আমার বন্ধু গুম হয়ে খানিক চেয়ে থাকে সেদিকে, ওকে যেন হতাশায় ছেয়ে ফেলেছে। আমার মনটা কেমন দমে আসে ওর ভাবসাব দেখে। হঠাৎ আমার বাহু ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান মারে। চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে চাপা উত্তেজনায়।—"ওস্তাদ।"

"কী"

ষড়যন্ত্র করার ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, তারপর বলে—"এমদাদের হাতের কাজগুলো দেখবে? চল।" আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমাকে টেনে নিয়ে চলল।

সেই চেনা বস্তির ঘর। গলিটা একদম ফাঁকা। মোড় ঘুরতেই অল্প গলার আওয়াজ পেলাম। তাকালাম। আমার বন্ধুর অবাক চোখ বড় বড় হয়ে আসে। আমরা আর এগোই না।

ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। ইসরাইল আর একটা বুড়ি। বুড়িই বটে, পাকা আমের কুঁচ্‌কে যাওয়া পরিপূর্ণতা ওর বলিরেখাঙ্কিত মুখে। চোখদুটোতে আমি বুঝি হঠাৎ অনেকখানি বড় পদ্মা নদী আর উধাও হু-হু বাতাসের আভাস পেলাম। ছেঁড়া নোংরা শাড়ির প্রান্ত দিয়ে বারবার নাক মোছে, এয়োতির লক্ষণ লাল পাড় শাড়ি! কপালেও আবছা সিঁদুরের দাগ।

ইসরাইলের সেই ঘর। এমদাদের হাতের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে যার দেওয়ালে। ইসরাইল তার নিজেরই ঘরটা ঝাঁট দিয়ে ধুলোগুলো একটা কাগজে জমা করছে এখন, আর বুড়ি চৌকাঠের গায়ে পা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ইসরাইল বলে—"তোমার তোরঙ্গ-প্যাঁটরা সবই তো গুছিয়ে দিলাম বুড়ি, ঘরও সাফা করে দিলাম। তো ঘরে ঢোক এবার, আর বসে কেন?"

বুড়ি আমতা আমতা করে বলে—"না, উবগার যা কইরলা বাবা, তাত—। মাজাটা ভাঙা। কাজ করণের শক্তি নাই। এই আমিই কিন্তু আছিলাম এককালে, সাতখান্ গাঁয়ে স্যাঁকল্ল্যার জগত বামনীর নাম করতে চিনত। তোমারগো পূজায় লল, পাব্বনে বল, ব্যাপারের বাড়িত বল, এই আমি। লোকে কইত জগত বামনী দশভূজা। তা—"

ইসরাইল চট্ করে বলে ওঠে—"তা তোমার ঘরটা তো এক রকম হল, এবার আমি যাই।"

বুড়ি ওর দিকে কেমন করে যেন তাকায়, তারপর হেসে ফেলে মাথা নামায়—"কী হইয়া গেছি অভাবের তাড়নে!" মুখ তোলে—"খাওয়াইবা কইলা না বাপ, ক্ষুধা যে বড়!"

"ও—হ্যাঁ।" ইসরাইল লজ্জিত হয়ে পড়ে—'মানে, আমার কাছে আর পয়সা নেই।...তা, যাবে আমার সঙ্গে বাইরে? আমার বন্ধুরা বসে আছে রাস্তায়, ওদের কাছ থেকে পয়সা নিতে হবে।"

"চল। না খাইলে আর পারি না। চাউল নাই পয়সা নাই। লাতিটা বারাইছে; ঘুরতেছে কিসের ব্যাভ্রমে। গান পাগলা ছাওয়াল।"

বুড়ি উঠে আসে। ইসরাইল দরজা বন্ধ করছিল, বারণ করে।—"ও আউজাইয়া আর কী হইব? ব্যাঙের আধুলি। কীইবা আছে আর!"

দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিতে গিয়ে দরজার পাল্লার ওপর বিবর্ণ কয়টা দাগ দেখেছিল ইসরাইল। তাদের ওপর দিয়ে আলগোছে আঙুলের ডগাগুলো বোলায়, কবে খড়ি দিয়ে একটা মানুষ আঁকার চেষ্টা হয়েছিল। ...ও ঘোরে—"তাহলেও তোমার ঘরটা তো খুলে রেখে যাওয়া যায় না।" অদ্ভুত ওর চোখদুটোর ভাব, আমি এতদূর থেকেও দেখতে পেলাম।

বুড়ির মুখ বেঁকে আসে—"ম্যাগো, কী আমার ঘর!...তোমারে তো কইছিই বাবা, এই ঘর আমার পছন্দ না। কেমুন বা বেশ পদ্মনকশা করা দরজাখান্ আছিল, কেমুন বা আঙ্গনাখান,...মানে, বোঝাই কেম্‌নে আমার ঘরের বেত্তান্ত, আর বোঝেই বা কেডা—"

"আচ্ছা, আচ্ছা চল।" ইসরাইল সন্তর্পণে ওকে ধরে নিয়ে এগোয়। বুড়ি এক পা গিয়েই মুখ উঁচু করে তাকায় ওর দিকে। "বাবা, তোমারে দেইখা আমার বা কার জানি কথা মনে জাগে। কে জানি ধইরত ঠিক এমনি কইরাই। কে—"

"বেশ, বেশ, চল এখন।" তাড়া লাগায় ইসরাইল। বুড়িটার দিকে আর যেন ও তাকাতে পারছে না। কিন্তু সামনে তাকাতেই আমাদের দুজনের সঙ্গে ওর মুখোমুখি হয়ে গেল।

লজ্জায় মুহূর্তের মধ্যে অতবড় জোয়ানটা কুঁকড়ে কতটুকু হয়ে যায়। বুড়ির কাঁধ থেকে ওর হাত অজানতে সরে যেতেই সেও তাকায় আমাদের দিকে, তারপর সভয়ে তার চওড়া বুকের কাছ ঘেঁষে যায়। শঙ্কাভরা চোখ তুলে তাকায়। ইসরাইল অভয় দেয়—"আমার বন্ধু ওরা।...ইয়ে, কীবে, এখানে?"

আমার বন্ধু এগিয়ে গিয়ে বলল—"ওর কাছে পয়সা আছে নাও।"

ইসরাইল আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমার বন্ধু ভালো করে দেখে ফিক করে হেসে দিল। বুড়িরও ফোক্‌লা মুখে একগাল হাসি জাগে।

ভ্যাপ্‌সা গরম হতাশার মধ্যে যেন এক ঝলক হাওয়া ঝিলিক দিয়ে গেল। ...আমার বন্ধু বন্ধুত্ব পাতাতে ভারী পটু।

রাস্তায় পড়ে ইসরাইল চাপা গলায় আমাকে বলে, আর আমার বন্ধু বুড়িকে নিয়ে একটু পেছনে আসে। —"মাপ করো একটু দোস্ত্। বলেছিলাম না, আমার ঘরে যে আছে তাকে ছিঁড়ে দু-টুকরো করতে না পারলে আমার সোয়াস্তি নেই,—তখন জানতাম না এই শালী বুড়ি ওখানে আছে।"

বড় রাস্তা দিয়ে আমরা তোরণটার কাছে এসে পড়লাম। ইসরাইল বলে —"বুড়ির এক লাতি আছে, ষোল বছরের জোয়ান লাতি।...আঠারো জনের সংসার খান্ খান্ হয়ে গেছে। কতক মরেছে, কতক কোথায় পালিয়েছে কেউ খোঁজ রাখে না। খালি এই দুটো এখানে ঠেকেছে।...এখানে এরা কিন্তু থাকতে চায়না, পদ্মার কিনারে কোথায় ঘর, সেইটে—"

কথা থামিয়ে ও ঘুরে তাকায়। ওর চোখে দরদ এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ভারী সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। দুনিয়ার যত রূপ ওর মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়েছে। ও ভালোবেসেছে।

...দূর থেকে মৃদু স্বর শুনে তাকিয়ে দেখি সেই গাইয়ে লোকটি শুয়ে শুয়েই গানটা আবার ধরেছে—"ও মনপবনের নাও..."

আমার বন্ধু বুড়িকে নিয়ে পৌঁছে গেল, ভারী বন্ধুত্ব হয়ে গেছে তাদের। সে প্রশ্ন করে—"কোথায় বাড়ি তোমার মাগো?"

"আরে বাপরে, ইসে, সেইডাই প্রশ্ন। প্রশ্ন তো সেইখানে। কনে বাড়ি মোর, কইরার পার?...পার না। গোলক ধাঁধার বারা ধাঁধা ইডা। ই হল স্যান্—"

কথা অসম্পূর্ণ রেখেই বুড়ি ফিক্ ফিক্ করে হাসে। অপর চোখটা কুঁচকে একটু বলে—"পদ্মা নদীর বিলাতীপানার ঘর কনে? কোহান্ দিয়ে যায় সেখানে?"

ইসরাইল আর আমার বন্ধু একবার চোখাচোখি করে। তারপর ইসরাইল বলে—"তোমার লাতি করে কী?"

"গান।" বুড়ি চোখ বোঁজে। "বড় ভালো। কত গান গাইত, কত্ত গান।...শুইন্‌ছনি? ঐ।"

আমরা কান পতি সবাই। তরুণ কণ্ঠে গানটা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। দূর থেকে ভেসে এলেও তার তেজ পরিষ্কার বোঝা যায়। সে গাইল—

…"রাঙ্গা সূর্যি উঠে সেথায় রাঙ্গায় তামাম্ পানি,
রাঙ্গা আকাশ তলে তাহার রাঙ্গা মরমখানি।
—রাঙ্গা নদীর পথ ধইরা সেই মোহনায় বাও,
ও মনপবনের নাও॥"

ঘুরে ফিরে গায়কটি গানের প্রথম কলি গাইছে, ঘুরছে পড়ছে নতুন বুকের সবখানি জমাট প্রেম।…লাল ছটায় ভরা আকাশের তলায় রাঙিয়ে রাঙিয়ে ওঠে মহান্ পদ্মা নদীর সবখানি উদারতা, সবখানি বিশালতা ঐ গানের পথ বেয়ে আমাদের মাঝখানে চলে এল।…

বুড়ি বলে ওঠে—"বাবা সকল, আসল কথাখান্ই যে বড় ভুইলতে আছ? খাবার কই?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।" ইসরাইল দম চাপে—"পয়সা দাও ওস্তাদ।"

পকেট হাতড়ে কয় আনা বের করে দিলাম। ইসরাইল চলে গেল খাবারের দোকানটার দিকে। আমার বন্ধু আর বুড়ি পাশাপাশি বসে, আমি চেয়ে চেয়ে দেখি।

এত কথাও বলতে পারে বুড়ি, একধার থেকে বলে। আমার বন্ধু বসে বসে পা চুলকোয়, আমি শুনি। বুড়ির কথায় কথায় সেই কোন এক গাঁয়ের ছবি ফুটে ওঠে। নিজেই সৃষ্টি করে রস, নিজেই হাসে, নিজেই ছল্ছল্ চোখ করে চুপ করে থাকে। এরই এক ফাঁকে ইসরাইল শালপাতায় ঠোঙ্গায় করে কিছু খাবার নিয়ে এল। খানিক খেয়ে বুড়ি আঁচলে বেঁধে রেখে দিল, গাইয়ে নাতির জন্যেই বোধকরি। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে পা ছড়িয়ে বসে পায়ে দু-হাত বুলোয়। তার নেশাটি ঠিক আছে আজও, খুঁট থেকে আলাপাতা বের করে মুখে দেয়। তারপর আবার ধরে কথা। ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, বলেই চলেছে ভিটের বৃত্তান্ত। আর ওর নাতিটির বোধহয় পদ্মা নদীর গান গাইতে সমান উৎসাহ।

…সেই কতদূর, আমরা সে সব দেশে যাইনি, ওর ভিটেটা ছিল। যেখানে রোজ সাঁঝ-বাতি জ্বলত, সেই লেপা আঙ্গিনায় তুলসীতলা ছিল।—আর সবার ওপরে ছিল এক চালতা গাছ। চালতা গাছের কথা বলতে বলতে বুড়ি প্রায়

পাগল হয়ে উঠল। বাড়ির এক কোণে বাঁশ ঝাড়ের ধারে, যেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জমে থাকত আম জাম কাঁঠালের ছায়া দিয়ে ঘেরা জায়গাটুকু,—সেইখানেই ছিল তার কত সাধের চালতা গাছ। আহা, কী চালতা গাছখান্‌রে!··· এখন হয়তো কত চালতা সেখানে ধরে আছে,···দিনমান ঝুলে থাকে, কেউ দেখারও নেই, কেউ শোনারও নেই। মাঝরাতে নিশাচর পাখিরা হয়তো ডানা ঝাপটায় সেখানে বসে, আর ঝুপঝাপ করে চালতা পড়ে। নিথর রাতের সেই শব্দ আমি পরিষ্কার অনুভব করলাম।···এখন চালতাগুলো হয়, আর পড়ে। হয়, আর বারে বারে পড়ে।···কলকাতায় চালতার কত দাম।

হঠাৎ বুড়ি আকাশের দিকে চায়। বিকালের পড়ন্ত রোদের আকাশ প্রায় ঢেকে এনেছে কালো কালো আকারহীন মেঘ। সীমানাগুলো তার মোটেই পরিষ্কার তীক্ষ্ণ নয়, কেমন যেন মিলিয়ে যাওয়া। বিশাল সেনা বাহিনীর মত মেঘের পর মেঘ এগিয়ে আসছে। যুদ্ধের বাজনা বাজছে সারা আকাশময়। সারা আকাশময়···বিদ্যুৎ খেলে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে, বিজলির আলোয় মেঘের কোলকে জ্বালিয়ে তুলে।

বুড়ি গালে হাত দেয়।—"ও মা কালবোশেখী যে ঘনঘটা কইরা আইল। ও বাবা, দেনারে আমারে ঘরে তুইলা। দে বাবা!"

ইসরাইল ওঠে; ওর হাত ধরে যায় খানিকদূর, তারপর ঘরে বুঁদ হয়ে বসে থাকা বন্ধুর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যায়। থম্‌কায়। আবার ঘুরে বুড়িকে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।...বুড়ির নাতির গানটা টেনে টেনে চলতেই থাকে!

আমি বললাম—"ওঠো। ঝড়বৃষ্টি এসে গেল, আর বসে কী হবে?"

"উঁ"—অন্যমনস্কভাবে ও তাকায়—"নাঃ। চল।"

উঠে দাঁড়াল আমার বন্ধু। বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত চেপে ধরল। উত্তেজিত গলায় বলল—"ব্যস্‌।···ঠিক আছে। এক কাজ করি। আমার যত বন্ধু আছে সবার বাড়িতে বাড়িতে যাই। তা হবে কম না আমার বন্ধু। বুঝলে, সবাইকে এককাট্টা করে ফেলি এই সবের মধ্যে দিয়েই..." ও চিন্তিত হয়ে পড়ে—"মানে, এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে হদিশটা বেরিয়ে যাবে। যাবেই।···ঠিক দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু পথ হয়তো আছে।"

নিজের মনেই যেন ও ওজন খুঁজে পায় না নিজের কথার। দু-বার মাথা চুলকে নেয়।

তারপর আবার বলে—"মাথায় শালা পোকা বের হয়ে গেল ভেবে ভেবে।...কিন্তু সব চাহিদা মেটানোর একটা রাস্তা...নাঃ ওস্তাদ, কী জানি।"

মনমরা হয়ে গেল ও। আমি কিন্তু খুশি হয়ে উঠেছি। রাজ্যের হাওয়া এতক্ষণ কোথায় বসে পরামর্শ করছিল, এবার ছুটে এসে আমাদের চুমু খেয়ে গেছে। একরাশ জোলো হওয়া।—

গানটির সুর তখনও ঘুরে ফিরে বাজছে। দু-পাশের ইতিহাসে ভরা ফুটপাথ ছেড়ে আমরা রাস্তার সুডৌল পিঠে এসে দাঁড়ালাম। তেতে আগুন হয়ে আছে রাস্তা। গাছের তোরণের আওতা ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। দিনের আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেছে আকাশের নীচু হয়ে আসা মেঘের ঘোমটার তলে। চাপা একটা জ্যোতিতে যেন ভরে গেছে আশ-পাশ। খুব ভালো করে মাজা কাঁসার বাসনের গায়ের চাক্‌চিক্যের মত চাপা জ্যোতি।

...তারপও বৃষ্টি নামল।

ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামল। সে আওয়াজের তলায় কোথায় তলিয়ে গেল একলা তরুণ কণ্ঠের গান, অনুভব করলাম। হাজার কণ্ঠে কারা যেন গানটা ধরে নিয়েছে।...

আমার বন্ধুর ঘামে-গরমে হাঁপিয়ে ওঠা শরীরের ওপর বৃষ্টি পড়তেই ও ভারী খুশি হয়ে উঠল। হঠাৎ নাক চোখ মুখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে, ও তলের ঠোঁটটা একটু এগিয়ে দিয়ে শব্দ করে মুখে জল টেনে নিতে থাকল। আকাশে বাজনা জোর হয়ে উঠল, মাটিতে বাজনা তার দোঁহার হল। ও পেছনে দেখে, বলে—"দেখ, দেখ!"

কী দেখব? ঘুরলাম। কৃষ্ণচূড়া গাছের তোরণ পাতায় পাতায় নেচে উঠছে, ফুলে ফুলে নেচে উঠছে। বৃষ্টির সাদা পর্দার আড়ালে কত মানুষের কত দুঃখ ধীরত্ব হয়ে উঠছে।

আমার বন্ধু মহানন্দে মাথার ওপর হাত চালিয়ে চুলগুলোকে লেপ্‌টে

সামনে করে দিল। খানিকটা জল-চুঁইয়ে পড়ে গেল। ও বলল—"দেখছ না? শুনছ না? রাস্তায় কান পাতো।"

ও নিজেই হাঁটু গেড়ে বসে রাস্তায় কান পাতল। মুখ বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—"দেখ, মনে হচ্ছে কত মানুষ কঠিন পায়ে হেঁটে আসছে, ...হাসছ? কান পাতো, নিজে কান পাতো। বড় বাজে বক তুমি।"

বৃষ্টির মোটা মোটা ছাঁট মসৃণ রাজপথের ওপর পড়ে ছিটকে যাচ্ছে। তাদেরই সঙ্গী হয়ে আমি মাটিতে কান পাতলাম।

গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ গুম্...

একতালে এগোচ্ছে কত মানুষ।

দাংগা

সোমেন চন্দ

লোকটা খুব তাড়াতাড়ি পল্টনের মাঠ পার হচ্ছিলো। বোধ হয় ভেবেছে লেভেল ক্রসিং-এর কাছে দিয়ে রেলওয়ে ইয়ার্ডে পড়ে নিরাপদে নাজিরাবাজার চলে যাবে। তার হাতের কাছে বা কিছু দূরে একটা লোকও দেখা যায় না—সব শূন্য, মরুভূমির মতো শূন্য। দূরে পাঁচ্‌ঢালা পথের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে দুই একটি সুদৃশ্য মোটরকার হুস্‌ করে চলে যায় বটে, কিন্তু এত তীব্র বেগে যায় যে মনে হয় যেন এইমাত্র কেউ তাকেও ছুরি মেরেছে, আর সেই ছোরার ক্ষত হাত দিয়ে চেপে সে পাগলের মতো ছুটে চলেছে! নির্জন রাস্তার ওপর মোটর গাড়ির এমনি যাতায়াত আরও ভয়াবহ মনে হয়। দূরে গবর্নর হাউসের গর্বময় গাম্ভীর্য মানুষকে উপহাস করে। পথের পাশে সারি সারি কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। মাঠের ওপর কয়েকটা কাক কিসের আশায় হেঁটে বেড়াচ্ছে! অনেক দূরে একটা ইঁদুরের মতো ঘুর্‌ ঘুর্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে? একটি সৈন্য। ওই সৈন্যটি আজ তিন দিন ধরে এক জায়গায় ডিউটি দিয়ে আসছে।

লোকটা মাঠ ছেড়ে রাস্তায় পড়লো। তার পরনে ছেঁড়া ময়লা একখানা লুঙ্গি, কাঁধে ততোধিক ময়লা একটি গামছা, মাথার চুলগুলি কাকের বাসার মতো উস্কখুস্ক, মুখটি করুণ। তার পায়ে অনেক ধুলো জমেছে। কোন গ্রামবাসী মনে হয়।

এমন সময় কথাবার্তা নেই দুটি ছেলে এসে হাজির। তাদের মুখে এখনো ভালো করে দাড়ি-গোঁফ গজায় নি। তাদের মধ্যে একজন কোমর থেকে একটা ছোরা বার করে লোকটার পেছনে একবার বসিয়ে দিলো, লোকটা আর্তনাদ করে উঠলো। ছেলেটি এতটুকু বিচলিত হলো না, লোকটার গায়ে যেখানে সেখানে আরও তিনবার ছোরা মেরে তারপর ছুটে পালালো। কুকুর যেমনি লেজ তুলে পালায় তেমি ছুটে পালালো। লোকটা আর্তনাদ করতে করতে গেটের কাছে গিয়ে পড়লো, তার সমস্ত শরীর রক্তে ভিজে গেছে,

টাটকা লাল রক্ত, একটু আগেও দেখে মনে হয় নি এত রক্ত ওই কংকালসার দেহে আছে!

মিনিট দশেক পরে এক সৈন্যবোঝাই গাড়ি এলো। সৈন্যরা বন্দুক হাতে করে গাড়ি থেকে পটাপট নেমে সার্জেন্টের আদেশে হাতের কাছে যাকে পেলো তাকেই ধরলো, হিন্দি বুলি ছেড়ে, সিগার খেয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে সার্জেন্টদের শ্বেতবর্ণ মুখ আরক্ত হয়ে এলো। দূরে যে সব সৈন্যরা ছিল তারা কতকটা শুভানুধ্যায়ী হয়ে যারা এদিকে জেলের ভাত খেতে আসছিলো তাদের থামিয়ে দিলো। উধার মাৎ যাইয়ো বাবু, মাৎ যাইয়ো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিন নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় অর্ধেকটা ঘেরাও হয়ে গেল। ছোটো-ছোটো গলি এবং সমস্ত রাস্তার মাথায় মাথায় সশস্ত্র পুলিশ সঙিন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ ঢুকতে পারবে না, কেউ বেরুতেও পারবে না। শৃঙ্খলিত করে একটা সামরিক বন্দীশালা তৈরি হলো।

কিন্তু শৃঙ্খলের ভিতরেও সংগ্রাম হয়। এক বিরাট সংগ্রাম শুরু হলো। সকলেই এখানে সেখানে ছুটোছুটি করতে লাগলো, চোদ্দবৎসরের বালক থেকে আরম্ভ করে সত্তর বছরের বুড়ো পর্যন্ত। এমন দৃশ্য শহরের জীবনে অভিনব।

লাইনের পাশে যাদের বাসা তাদের পালাবার আর অবসর কোথায়? তাদের মুখ চুন হয়ে গেল, কেউ বা হিন্দুত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বীরের মতো অগ্রসর হলো। এক রিটায়ার্ড অফিসার ভদ্রলোক একটা ব্যাপার করলেন চমৎকার। বাক্স থেকে বহু পুরনো একটি পাৎলুন বার করে সেটা পরে এবং তার ওপর একটা জামা আর একটা পুরনো কোট চাপিয়ে এক সুদর্শন যুবকের মতো ওপর থেকে নীচে নেমে এলেন। তাঁর শরীরের ভিতর আগের সেই তেজ দেখা দিয়েছে, যখন ওপরওয়ালা অনেক সাহেবসুবোকে বকে ঝকে নিজের কাজ তিনি করে যেতেন। সেই দিন আর এখন কই, হায়, সেই দিনগুলি এখন কোথায়?

ভদ্রলোক নীচে নেমে এলেন, পাৎলুনের দুই পকেটে কায়দা করে দুই হাত ঢুকিয়ে দুই পা ফাঁক করে গেটের ওপর দাঁড়ালেন। ওই যে, রক্তবর্ণ সার্জেন্টটি এদিকেই আসছে। ভদ্রলোক তার সংগে বড়বাবু-সুলভ ইংরিজি আরম্ভ করে দিলেন।

শিক্ষয়িত্রী সুপ্রভা সেনের ব্যাপার আরও চমৎকার। সে তো মেয়েদের

কোন ইস্কুলে মাস্টারি করে। শহর দাংগা-বিধ্বস্ত বলে প্রচুর ছুটি উপভোগ করছিলো। আজও এইমাত্র দুপুরের রেডিও খুলে বসেছে। ছুটির দিন বলে একটা পান চিবুচ্ছে। ভোরবেলা ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছোটো ভাইকে গাধা বলে শাসিয়েছে, খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে কত কিছু ভেবেছে, আর এখন বসেছে রেডিওর কথা ও গান শুনবে বলে। তার চোখে চশমা, এক গাছি খড়ের মতো চুল সযত্নে বাঁধা, আঙুলগুলি শুক্‌নো হাড়ের মতো দেখতে, আর শরীরের গঠন এমন হয়ে এসেছে যে যত্নবতী না হলেও চলে। এমন সময় বাইরের রৌদ্রে গুর্খাদের বন্দুকের সঙিন ঝলমল করে উঠলো। তাদের শ্বেত অধিনায়কের গর্বোন্নত শির আরও চোখে পড়ে। এবং বুটের খট্‌মট্‌ আওয়াজ। সুপ্রভা সেন আর তিলমাত্র দ্বিধা না করে নীচে চলে গেল, বসনে এবং ব্যবহারে বিশেষ যত্নবতী হয়ে সাহেবের সম্মুখীন হলো।

মুহূর্তে এই গল্প লাফিয়ে লাফিয়ে চললো এবং সুপ্রভা সেনের অনেক খ্যাতি ও অখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

লাইনের পাশে কোনো বাড়িই খানাতল্লাসীর হাত থেকে রেহাই পেলো না। রাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় যেমন খানাতল্লাসী হয় তেমন অবশ্য নয়। তল্লাসী হয় শুধু মানুষের।

ভিতরের দিকে তেমনি ছুটোছুটি, একবার এদিকে একবার ওদিকে। কিন্তু সকলের মুখেই হাসি, বিরক্তি বা রাগের চিহ্নমাত্র নেই। অশোকের দেখে রাগ হলো। এই ব্যাপক ধরপাকড় আর ব্যাপকতর ঘেরাও মানুষের কাছে একটা sports হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধঃপতন বা পচন একেই বলে। অশোকের ইচ্ছে হয় চিৎকার করে বলে, আপনারা কেন হাসছেন? কেন হাসছো তোমরা?

একটা জায়গায় কিছু লোক জমে গেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভেঙে গেল। লোকগুলির মুখে হাসি আর ধরে না, তারা আর কিছুতেই সিরিয়স্‌ হতে পারছে না। অশোকের মনে হলো, এরা একেবারে জর্জরিত হয়ে গেছে।

রাস্তা দিয়ে একটা ফিরিওয়ালা যাচ্ছিলো—পুরনো কাগজের বোঝা নিয়ে। তার পায়ে একটা ময়লা কাপড়ের প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে হঠাৎ থেমে বললে, বাবুরা, হাসছেন? হাসুন, আপনাদেরই দিন পড়েছে, গবর্নমেন্টের

যেমন পড়েছে। দিন পড়েনি শুধু আমাদের, আমরা মরবো, কাল মরবো।

অশোক মন্থর পায়ে হেঁটে বাসায় গেল। এইমাত্র আর একটা ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেছে। দোলাইগঞ্জ স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যাল পার হয়ে এক বৃদ্ধ যাচ্ছিলো—ঘটনার বিবরণ শুনতে আর ভাল লাগে না। কখনো নিজেকে এত অসহায় মনে হয়!

অশোকের মা খালি মাটিতে পড়ে ভয়ানক ঘুমুচ্ছিলেন। ছেলের ডাকে ঘুম থেকে উঠে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, যা শিগ্‌গির, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি। একশো বার বলেছি যে যা বাপু মামাবাড়িতে কিছুদিন ঘুরে আয়, মারামারিটা কিছু থামলে পর আসিস, না তবু এখানে পড়ে থাকা চাই, একটা ছেলেও যদি কথা শোনে! মাটি কামড়ে পড়ে থাকা চাই, শহরের মাটি এমনি মিষ্টি, না?

অশোক হেসে বললে, এত কাজ ফেলে কোথায় যাই বলো?

উহুঁ, কাজ না ছাই! কাজের আর অন্ত নেই কিনা! তোদের কথা শুনবে কে রে? কেউ না। বুঝতে পেরেছি তোমাদের কতখানি জোর, কেবল মুখেই পট্‌পটি, হ্যান্ করেঙ্গা, ত্যান্ করেঙ্গা!

জানো কংগ্রেস মিনিস্‌ট্রির সময় কানপুরে কী হয়েছিলো? আমরা দাংগা থামিয়ে দিয়েছিলুম।

মা দুই হাত তুলে বললেন, হয়েছে। অমন ঢের বড় বড় কথা শুনেছি। তোদের রাশিয়ায় কী হলো শুনি? পারবে জার্মেনীর সংগে, পারবে?

অশোক বাইরের দিকে চেয়ে বললে, পারবে না কেন মা? বিপ্লবের কখনো মরণ হয়?

মা হাঁ করে চেয়ে রইলেন, একটু পরেই চুপি চুপি বললেন, হ্যাঁরে, একী সত্যি?

কী মা?

ওই যে উনি বলেন, জার্মানী রাশিয়ার সব নিয়ে গেছে, একেবারে আমাদের দেশের কাছে এসে পড়েছে?

অশোক হো হো করে হেসে উঠলো, এরা হিটলারের চেয়েও লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন।

এমন সময় অজু মানে অজয় এসে হাজির। অজু অশোকের ছোটো ভাই। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, নবাববাড়ি সার্চ হয়ে গেছে।

অশোক চোখ পাকিয়ে বললে, এটি কোত্থেকে আমদানি, শুনি?

বারে, আমি এইমাত্র শুনলুম যে!

তোমার দাদারা বলেছে নিশ্চয়?

অজয় একজন 'হিন্দু সোশ্যালিস্ট'। সম্প্রতি দাংগার সময় জিনিসটির পত্তন হয়েছে। এই বিষয় শিক্ষা নিতেই সে পাগলের মতো ঘোরাফেরা করে, উচ্চস্বরে মানুষের সংগে তর্ক করে, হিট্‌লারের জয়গান করে, হানহানিতে প্রচুর আনন্দিত হয়।

বারে, আমি নিজের কানে শুনেছি! একটা সোল্‌জার আমায় বললে—

তোমায় কচু বলেছে!

অজু কর্কশস্বরে বললে, তোমরা তো বলবেই—তারপর মৃদুস্বরে—তোমরা হিন্দুও নও, মুসলমানও নও—

আমরা ইহুদির বাচ্চা, না রে? অশোক হা হা করে হেসে উঠলো, বললে, সার্চ হোক বা না হোক, তাতে rejoice করবারই বা কী আছে, দুঃখিত হবারই বা কী আছে? আসল ব্যাপার হলো অন্য রকম। দেখতে হবে এতে কার কতোখানি স্বার্থ রয়েছে।

অজয় চুপ করে ছিলো, সেও খুক্ খুক্ করে হেসে উঠলো।

দুপুর আস্তে আস্তে বিকেলের দিকে এগিয়ে গেল। অশোক রাস্তায় বেরিয়ে দেখতে পেলো, এইমাত্র পুলিশ তুলে নেওয়া হয়েছে। লোক হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। এই অঞ্চলেরই অধিবাসী যারা বাইরে ছিল, অনাহারে তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকেরই মুখের হাসিটি শুকোয়নি। ভিতরে এবং বাইরে যারা ছিল তাদের সকলেরই অভিজ্ঞতার বর্ণনা চলতে লাগলো। ওদিকে দুই গাড়ি বোঝাই ভদ্রলোকদের ধরে নেওয়া হয়ে গেছে। একজন ভদ্রলোক গাড়িতে বসে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে দিলেন।

কার আবার স্বার্থ থাকবে? স্বার্থ রয়েছে হিন্দু আর মুসলমানের। এই বলে অজয় অন্যদিকে চেয়ে একটা গান গাইতে লাগলো।

মা বলে উঠলেন, তোরা ভায়ে ভায়ে এমন ঝগড়া করিস কেন বল্‌তো? আমাদের সময় আমরা বড়ো ভায়ের দিকে মুখ তুলে কথা কইতুম না, মুখে

মুখে তর্ক করা তো দূরের কথা। কিন্তু দাদা আমার যা ভালোবাসতেন! ছোটো বেলায় অনেক শীতের রাত্তিরে আমরা এক লেপের তলায় শুয়ে ঘুমিয়েছি।

অশোক গালে হাত দিয়ে বললে, হয়েছে। এবার ভায়ের গল্প আরম্ভ হয়ে গেছে, আমাদের তাহলে উঠতে হয়।

তারপর আস্তে আস্তে সন্ধ্যা এগিয়ে এলো। এবার তবে বাসায় ফিরতে হয়। কিছু পরেই সান্ধ্য আইন শুরু হয়ে যাবে। রাস্তাঘাট নির্জন হবার আগে একটা মস্ত ঠেলাঠেলি হয়ে গেছে। পুলিশরা মানুষের শরীর সার্চ করে দিচ্ছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরা একেবারে হাত তুলে দাঁড়িয়ে যায়। এক ভদ্রলোক একটা পেন্সিল কাটা ছুরি নিয়ে ধরা পড়লেন। সকলে তার নির্বুদ্ধিতার নিন্দা করতে ছাড়লো না। ওদিকে সমস্ত দোকানপত্র আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটু আগেও রাস্তার পাশে একটা মেলা বসেছিলো যেন, এখন সকলেই শেষ ডাক দিয়ে চলে যাচ্ছে। রিটায়ার্ড অফিসাররা নিজেদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পরম স্নেহের দৃষ্টিতে সেই অস্থায়ী হিন্দু দোকানদারদের দিকে বার বার তাকাচ্ছেন, ওদের এখন পুত্রবৎ মনে হচ্ছে, অথবা বোমা বিধ্বস্ত লণ্ডন নগরীর অসংখ্য রিফিউজি!

অশোক বাসার কাছে গিয়ে দেখে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে যেতেই বললেন, বাবা আশু, তোর বাবা তো এখনো এলো না! তারপর ফিসফিস করে—তাছাড়া, আজ আবার মাইনে পাবার দিন।

কিছুমাত্র চিন্তার চিহ্ন না দেখিয়ে অশোক তৎক্ষণাৎ বললে, আহা, অত ভাবনা কিসের? এখনো তো অনেক সময় আছে।

অনেক নয়, আশু, সাতটা বাজতে আর আধ ঘণ্টাও বাকি নেই।

অশোক আবার রাস্তায় নেমে এলো। পেছনে ছোট ভাই নীলু তার মা'র আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। বেলাও মা'র পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাস্তায় ক্রমেই লোক জমে আসছে। যারা কিছুদূরে যাবে তাদেরও দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়েছে। কয়েক মিনিট পরে পরেই ছোটো ছোটো সৈন্যদল মার্চ করে যাচ্ছে। আকাশের রঙ ক্রমেই ধূসর হয়ে আসছে। রাস্তা আর দালানের গায়ে একটা ছায়া নেমেছে। বাদুড় উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে!

এই সাতটা বাজলো। অশোক ফিরে এলো। মা এখনো বাইরের দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে। চোখ দুটি ভোরের তারার মতো করুণ।

আশু, এখন উপায় ? মা ভাঙা গলায় বললেন। তাঁর চোখ জলে ভরে এসেছে।

অশোক কিছু বললে না। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে খালি তক্তপোশের ওপর শুয়ে পড়লো। তার মুখ কুঞ্চিত হয়ে এসেছে, চোখের ওপর একটা বিষম দুর্ভাবনার চিহ্ন স্পষ্ট। হয়তো এক কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হতে চলেছে সে। নীলু তার হাত ধরে ডাকলো, বড়দা ও বড়দা ? বড়দা, বড়দা গো ? বারে, কথা বলে না। ও বড়দা ? বারে ! বারে ! নীলু কেঁদে দিলো। বাবাগো বলে নাকি সুরে কাঁদতে লাগলো।

ওদিকে মাও কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। বেলাও তাঁর পাশে বসে দুই হাঁটুর ভিতর মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এছাড়া সমস্ত বাড়ির মধ্যে একটা ভয়াবহ গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। অন্ধকার নেমে এসেছে রাস্তায়। ঘরের অন্ধকার আরও সাংঘাতিক। আলো জ্বালবে কে ? আবহাওয়া ভুতুড়ে হয়ে উঠেছে। বাইরে ঘন ঘন বাসের হর্ন শোনা যায়। সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। যেন কোনো যুদ্ধের দেশ। অথবা কোনও সাম্রাজ্যবাদের শেষ শঙ্খধ্বনি, বার্ধক্যের বিলাপ।

পাশের বাড়িতে ভয়ানক তাসের আড্ডা জমেছে। বেশ গোলমাল শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আড্ডা ছেড়ে টর্চ হাতে করে বিমল এলো। বিমল ছেলেটিকে ভালোই মনে হয়। কথাবার্তায় অনেক সময় ছেলেমানুষ, অনেক সময় পাকাও বটে। সে বললে, অশোকবাবু চলুন।

অশোক প্রস্তুত হয়েই ছিল। খালি পায়েই সে বিমলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বিমল টর্চ জ্বালিয়ে এগুতে লাগলো, মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো, কোনো পুলিশ আসছে কিনা। বাড়িটা বেশি দূরে নয়। অলিগলি দিয়ে নিরাপদেই যাওয়া যায়। বিমল যথাস্থানে গিয়ে ডাকলো, সূর্যবাবু বাড়ি আছেন ?

ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, কে ?

আমরা। দরজাটা খুলুন।

সূর্যবাবু নিজেই এসে দরজা খুললেন, হেসে বললেন, কী ব্যাপার ?

বিমল বললে, আমরা আপনার ফোনে একটু কথা কইতে পারি ?

নিশ্চয়ই,নিশ্চয়ই। সূর্যবাবু সাদরে ফোন দেখিয়ে দিলেন।

বিমল স্টিমার অফিসে ফোন করলো, অনেকক্ষণ পরে কে একজন লোক এসে বললে, সুরেশবাবু কে ? সুরেশবাবু টুরেশবাবু বলে এখানে কেউ নেই। ও দাঁড়ান, দাঁড়ান। ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা ঘণ্টাখানেক পরে আবার আসুন, আমি খুঁজে আসছি।—বিমল অনেক বার ডেকেও আর কোনও উত্তর পেলো না। ফোন রেখে অশোকের দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন, আবার আসবো'খন।

অশোক ফিরে এলো। দরজার কাছে মার জলভরা চোখ জ্বল্ জ্বল্ করছে। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। অশোক বললে, পরে যেতে বলেছে। এই শুনে মা আবার ভেংগে পড়লেন, ভগ্নস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। মাটির দিকে চেয়ে অশোক মনে মনে বললে, "আগামী নতুন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সংগে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ দিয়েছি, তাদের সুখ-দুঃখ, আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেমন বর্তমানের সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটি। সেজন্য আমার গর্বের আর সীমা নেই। আমি জানি, আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে, প্রতিক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপরায়ণ হলুম, আমার কোনো ভয় নেই।"

এমন সময় পাশের ঘরে আলো দেখা গেল—আলো নয় তো আগুন। কাগজ পোড়ার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। অশোক গিয়ে দেখলো হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আবেদনের ইস্তাহারগুলি স্তূপীকৃত করে অজয় তাতে আগুন দিয়েছে।

অশোক তৎক্ষণাৎ আগুন নিবানোর চেষ্টা করতে করতে বললে, এসব কী করছিস ?

কী করবো আবার ! মড়া পোড়াচ্ছি !

অজু, তুই ভুল বুঝেছিস। চোখ যখন অন্ধ হয়ে যায়নি, একটু পড়াশোনা কর, তারপর পলিটিকস্।

দাদা, তোমার কম্যুনিজম রাখো ! আমরা ওসব জানি।

কী জানিস, বল্ ? অশোকের স্বরের উত্তাপ বাড়লো।

সব জানি। আর এও জানি, তোমরা দেশের শত্রু--

অজু, চুপ করলি ?

অজয় নিজের মনে গুম্ গুম্ করতো লাগলো।

অশোক উত্তপ্ত স্বরে বললে, ফ্যাসিস্ট এজেন্ট। বড়ো লোকের দালাল। আজ বাদে কালের কথা মনে পড়ে যখন 'হিন্দু-মুসলমান ভাইবোনরা' বলে গাধার মতো ডাক ছাড়বি ? তখন তোর গাধার ডাক শুনবে কে ? পেট মোটা হবে কার ? স্টুপিড, জানিস্ দাংগা কেন হয় ? জানিস প্যালেস্টাইনের কথা ? জানিস আয়ারল্যাণ্ডের কথা ? মূর্খ !—কিন্তু একটা তীব্র আর্তনাদ শুনে হঠাৎ অশোক থেমে গেল, পাশের ঘরে গিয়ে দেখলো, মা আরও অস্থির হয়ে পড়েছেন।

কয়েকদিন পরে। অশোক বাইকে চড়ে একটা সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মিটিঙে যোগদান করতে যাচ্ছিলো। এক জায়গায় নির্জন পথের মাঝখানে খানিকটা রক্ত দেখে সে সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। সারাদিন আকাশ মেঘাবৃত ছিল বলে রক্তটা অত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়নি, এখনো খানিকটা লেগে রয়েছে। কার দেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে ? অশোকের চোখে জল এলো, সব কিছু মনে পড়ে গেল। সে চারিদিক ঝাপ্‌সা দেখতে লাগলো, ভাবলো, এই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে কবে ?

অমিত্রাক্ষর

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মিনু জিজ্ঞেস করল, 'বাপি আজ আসবে না মা ?'

আশ্চর্য! ঘুম ভেঙেছে ঘণ্টাখানেক আগে, কিন্তু একবারও এ কথাটা মনে হয়নি উমার!

অথচ উমা যে জানত না তা নয়, দেড় বছর আগে থেকেই এই দিনটি তার জানা, দিনের পর দিন এই দিনটার কথা মনে পড়েছে, দিন যত ঘনিয়ে এসেছে উত্তেজনা বেড়েছে তত—সে-উত্তেজনা পুরো আনন্দেরও নয়—আনন্দ-আশঙ্কা-মেশানো দুর্বোধ্য অকথ্য এক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে। কি করবে কি করা উচিত, ভেবে ভেবে কূলকিনারা পায়নি! জীবনের জটিলতম সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে প্রশ্নটা।

কাল বিকেলে হাবুলরা এসেছিল, জেলগেটে ভূপেনকে অভ্যর্থনা জানাবার কাজে উমাকেও তাদের সাথী হতে বলেছিল—এক কাপ করে চা খাইয়ে হেসে দুটো মিষ্টি কথা বলে সরাসরি সে-প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে উমা সকলকে বিদায় করে দিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সে টিউশনিতে যেতে ভুলে গিয়েছিল। এবার আর দুর্বোধ্য নয়, স্পষ্টই বুঝতে পারল যে স্বামীর মুক্তি-সংবাদে সে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ফের সেই পুরনো দিনের পুনরাবৃত্তি! অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারেনি, ভেবে ভেবে সারা হয়েও হদিশ পায়নি ভাবনার। এবার কি সত্যি-সত্যিই তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে নাকি? রাত-ভোর ভয়ানক বীভৎস সব স্বপ্ন দেখেছে, আর সকালে উঠেই ভুল গেছে সব কিছুই? আশ্চর্য!

'বল না মা, বাপি আসবে নাকি আজ ?'

'কি জানি, আসবে হয়ত! তুমি এখন তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে পড়তে বস।'

বিছানায় শুয়ে শুয়েই মিনু প্রশ্ন করছিল। অন্যদিন এই অবস্থাতেই তাকে টেনে তুলে মুখ ধোয়াতে পাঠাতে হয়। আজ সে নিজেই তড়াক করে উঠে

বসল। বলল, 'এক্ষুনি আমি মুখ ধুয়ে আসছি। কিন্তু আজ আর পড়ব না মা, রোজই তো পড়ি।'

'রোজই তো খাও! তবু—

উমার গলা জড়িয়ে ধরে মিনু বলল, 'না মা, লক্ষ্মি-মা—বাপি আসবে আজ! তুমি আমায় সাজিগুজি করে দাও, আমি চুপটি করে জানলার ওপর বসে থাকব, একটুও দুষ্টুমি করব না। দূর থেকে বাপিকে দেখলেই—'

'এখন যাও, চোখেমুখে জল দিয়ে এস আগে।' গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলে উমা তাড়াতাড়ি বিছানা গুছোতে লাগল। খেয়াল ছিল না, কাজে তাই ঢিল দিয়েছিল—নইলে কত কাজ বাকি এখনও! সকালেই যখন আসছে মানুষটা, এতদিন পরে জেল থেকে ফিরে আসছে—কুকারের সিদ্ধ-ভাত তো আর সামনে বেড়ে দেয়া যায় না? রান্নার একটা ব্যবস্থা করতে হয়, বাজারে পাঠাতে হয় কাউকে, ইসকুলেও একটা খবর দেয়া দরকার। এবার অবিশ্যি স্পষ্টই সে জানিয়ে দেবে যে, ওই ভাবে যদি চলে ভূপেন তবে তার সঙ্গে উমার থাকা আর সম্ভব হবে না। দাম্পত্য জীবনে গোঁজামিল অসম্ভব। কিন্তু দেড় বছর পরে একটা মানুষ জেল থেকে ফেরা মাত্রই তো হাজার সত্যি হলেও এই ধরনের কথাগুলি বলা যায় না মুখের ওপর! বিশেষ মানুষটা যখন শত্রু নয়, স্বামী।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই মিনু ফিরে এল। 'আমার মুখ ধোয়া হয়ে গেছে মা, এই দেখ দাঁত—কেমন ধপ ধপ করছে। এবারে—'

'মাসিকে একবার ডাক তো।'

'সাজিগুজি—?'

'যা বলি শোন আগে।' উমা ধমক দিয়ে উঠল।

ম্লান মুখে মিনু বেরিয়ে যাচ্ছিল, নিভাননী ঘরে ঢুকলেন।

'এসো নিভাদি, তোমাকেই ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম।'

উমার কথায় কান না দিয়ে নিভাননী বললেন, 'এই সাত-সকালে মেয়েটাকে বকছিস কেন বলত? এতদিন পরে বাপ আসছে, খুশিতে বলে মেয়েটা সারা বাড়ি মাথায় করেছে।'

'ও, এই ক'মিনিটেই বুঝি পাড়া জানান্ হয়ে গেছে?'

'কেন, পাড়ার কেউ জানত না কি। ছেলেরা কোন্ ভোরে দল-বেঁধে

বেরিয়ে গেছে।' দু'পা এগিয়ে এসে সস্নেহ অনুযোগের স্বরে নিভাননী বললেন, 'তুই এখনও ভূত সেজে আছিস। তাড়াতাড়ি সব সেরে নে, তারপর স্নানটান করে একটু সব্যিভব্যি হয়ে থাক। এমনিতেই যা চেহারার ছিরি করেছিস, চিনতে পারলে হয়।'

'স্নান করে চন্দনের ফোঁটা কেটে বেনারসী জরোয়া পরে পথের পানে হাঁ করে চেয়ে থাকি, কেমন?'

'যদি থাকিসই, লজ্জা কিসের লো? পরপুরুষের তরে তো আর থাকছিসনে—ন্যাকামি ছাড়।'

'ন্যাকামি আমি করি না নিভাদি। কিন্তু কাকে এখন বাজারে পাঠাই বল তো? পরিতোষবাবু নিশ্চয় চলে গেছেন—'

'নিজেই যা না, অমন মদ্দ-মেয়ে তুই! আর না গেলেই বা বাজারে, উনি কি তোর কথা শুনতেন নাকি? হাবুলদের সঙ্গে যাসনি বলে যা চটে গেছেন!'

উমা হাসল। চাকরিজীবী নির্বিরোধ প্রৌঢ় ভদ্রলোক। আর পাঁচজন বয়স্ক কেরানীর মতই সংসারের নানান ঝামেলায় সদাব্যস্ত। নিভাদি চাকরি করেন না, কিন্তু এই নাতিবৃহৎ সংসারটির হাল তিনিই ধরে আছেন। স্বামী-অন্ত প্রাণ. পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ের মা হলে কি হবে, স্বামীর প্রসঙ্গে এখনও মুখের আদল তাঁর বদলে যায়। নিজের সত্তা একেবারে বিসর্জন দিয়ে কি ভাবে স্বামীকে আশ্রয় করে বাঁচতে হয়, দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে হয়, তার আর্ট ভালো করে জানেন নিভাদি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ওদের খিটিমিটি না লাগে তা নয়, কিন্তু সেটা কখনও জীবনের জটিলতম সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না। খাওয়া-পরার দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবনে ওঁরা খুশি, তৃপ্ত। অতি-সাধারণ নাতিশিক্ষিতা কোন নারীর যৌবন পেরিয়ে এসে জীবনের জটিল সমস্যা উপলব্ধির ক্ষমতা থাকে না, কুড়ি বছরের কেরানীও জীবনকে নিতান্ত শাদামাঠা হিসেবে গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত। উমা-ভূপেনের মনোমালিন্যকেও ওঁরা তাই সাধারণ দাম্পত্য কলহ বলেই ধরেছেন। সকালে ঝগড়া করে না খেয়ে আপিসে গিয়ে সন্ধ্যায় যখন শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে পরিতোষবাবু ফিরে আসেন, স্বাভাবিক ভাবেই সারাদিনের অনাহারী নিভাদি এক হাতে পাখা আরেক হাতে সরবতের গেলাস নিয়ে হাসি মুখে

অপরাধী ভঙ্গিতে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। আর চাপা স্বরে সামান্য কয়েকটা কথা কাটাকাটির পর ভরদুপুরে না-খেয়ে না-দেয়ে যে মানুষটা বেরিয়ে গেল, একেবারে দেড় বছরের মত জেলে চলে গেল—সে আজ ছাড়া পাবে অথচ স্ত্রী জেলগেটে তাকে স্বাগত জানাবে না, জেলগেটে না যাক নিজের ঘরেও অন্তত তাকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে না—একথা ভাবতেই পারেন না পরিতোষবাবু নিভাদি। নিভাদির ওপর মায়া হয়, হয়ত খানিকটা ঈর্ষাও জাগে।

মুখে হাসি টেনে এনে উমা বলল, 'তোমার মত স্বামীভাগ্য যদি সকলের হত নিভাদি!'

'এ সব কি অলুক্ষণে কথা, ছি!' নিভাননী এসে উমার হাত ধরলেন, 'মেয়েমানুষের এত দেমাক ভালো নয় লো।'

'দেমাক!'

'তবে কি, অভিমান? বেশ তো, অভিমানের মান যে রাখবে সে আগে আসুক, দেখবি পায়ে ধরে মান ভাঙাবে।'

নির্বিকার কণ্ঠে উমা বলল, 'মান-অভিমানের কথা নয় নিভাদি, এ হল—'

'থাম মুখপুড়ি, তোর কোন কথা আমি শুনতে চাইনে। মুখ্যুসুখ্যু হলে কি হবে, মুখ দেখে আমরাও কিছু কিছু বুঝি, বুঝলি। এই দেড় বছর ধরে হাসি নেই তোর মুখে, দিনকে দিন চেহারা—'

ম্লান হেসে উমা বলল, 'তা দুঃখ এক-আধটু হবে না কেন বল, মানুষটা তো আর পর নয়! তার ওপর সংসারের সব দায়িত্ব। দুদণ্ড বসে হাসব যে টিউশনি চাকরি করে সময় পাই নাকি?

নিষ্প্রাণ নিরুত্তেজ স্বর উমার। নিভাননী অবাক চোখে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকেন—তাঁর পাঁচানো কথারই সহজ সরল জবাব দিল উমা, অথচ এর পর কি বলে জের টানা যায় কথার?

লেখাপড়া জানা চাকুরে মেয়েদের ধরনই এমনি—নিজের মনকে নিভাননী এই বলে প্রবোধ দিয়ে খানিক চুপ করে থেকে আচমকা এক নতুন প্রসঙ্গ এনে ফেললেন, 'এবেলা আর রান্নার হাঙ্গামা করিসনি, আমার ওখানেই দুটি খাবি সবাই। এখন একটু মাথা ঠাণ্ডা করে থাক দিকি।'

মিনু এতক্ষণ আয়না-চিরুনি-রিবন হাতে নিয়ে এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে

ছিল। উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আজ আমাদের নেমন্তন্ন বড় মাসি? সব্বাইকার?'

'হ্যাঁ মাসি, সব্বাইকার। তুমি বরং বুলুদির কাছ থেকে চুল বেঁধে এসো, মাকে একটু কাজ করতে দাও।'

ঈস্, দেড় বছর আগেকার কয়েকটা দিনকে যদি মন থেকে আজ একেবারে মুছে ফেলা যেত!

আসলে সত্যিই তো মানুষটা ভূপেন খারাপ নয়। উমাকে যে ভালোবাসে তাতেও সন্দেহ নেই। মানুষটা শুধু বদলে গেছে, ভয়ানক রকম বদলে গেছে—তাই ভালোবাসার ধরনও তার বদলে গেছে। উমা যা চায় যে ভাবে চায়, পাচ্ছে না—এই মাত্র। কিন্তু এইটেই বা কম কি? কোন রাজনৈতিক নেতাকেই যদি বিয়ে করার সাধ হত, নিশীথ তো অনেক যোগ্য পাত্র ছিল ভূপেনের চেয়ে। নিশীথকে বিয়ে করলে চিরদিনের জন্যে বাপ-মায়ের সঙ্গে এমন একটা মন-কষাকষির সৃষ্টি হত না, বউবাজারের এই এঁদো গলির ভাড়াটে বাড়ির দেড়খানা ঘর নিয়ে নয়—আবাল্য যে-পরিবেশে মানুষ হয়েছে বিবাহোত্তর জীবনটাও কাটাতে পারত সেই রকম পরিবেশে হেসে খেলে আর পাঁচটা বান্ধবীর মত। কিন্তু না, সে সব কিছু চায়নি উমা, অহেতুক প্রাচুর্যের পরিবেশ নয়, রাজনীতির হট্টগোলও না—শান্ত সুখী নিরিবিলি ছোট্ট একটি সংসারের স্বপ্নই সে দেখেছে ভূপেনের সঙ্গে আলাপটা ঘনিষ্ঠতার হবার পর থেকে। ভূপেনের গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনতে শুনতে তার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছে আর সেই স্বপ্নটা জোরালো এক বাসনার জোয়ার হয়ে যা-মন-চায়-তাই করার বেপরোয়া নেশায় আকুল করে তুলেছে তাকে। শুধু স্বামী আর সন্তান নিয়ে একটি পৃথিবী—পৃথিবীর কারো কোন ক্ষতি তারা করতে চায় না—তেমনি নিজেদের জীবনে বাইরের কোন অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপও সহ্য করবে না। যদি কোন দুঃখ আসে বেদনা আসে, ভয় কি—কালো রোগা অতি-সাধারণ একটি মানুষের—তার স্বামীর—গলায় আছে সোনারকাঠির জাদু। আশ্চর্য এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করে ভুলিয়ে দেবে সব কিছু।

এ স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে? বিশেষত উমার মত

মেয়ে—কত কিছু করবার সাধ ছিল যার জীবনে, কিন্তু শুধু এক সকলের অমতে জোর করে ভূপেনকে বিয়ে করা ছাড়া আর কিছুই যে করতে পারল না!

তার এই স্বপ্নকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছিল নিষ্ঠুর ভূপেন। গানকে সে করেছিল শ্লোগানের শামিল। উমাকে তার গান শোনাবার অবসর হত না, কিন্তু দ্যাখ গিয়ে, মাঠে-ময়দানে সভার আগেই সে হারমোনিয়াম নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কী-সব গান! সে গান শুনে চোখের সামনে ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবীর রূপ বদলায় না, থরথর করে ওঠে না দেহ-মন দুর্বার আবেগের উত্তেজনায়—সে-গানে জীবন-যৌবনের সব স্বপ্ন-কামনা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, রূঢ় বাস্তব বীভৎস পৃথিবীটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

'কি করবো বলো, গানকে আমিই কি কম ভালোবাসতাম! ভালো অবিশ্যি গানকে আজো বাসি।'

'এই তার নমুনা!'

'কি করব, গায়ককে যদি উদয়াস্ত কেরানীগিরি করতে হয়—'

'বেশ, তুমি চাকরি ছেড়ে দাও, টিউশনি ছেড়ে আমি ইস্কুলে কাজ নিই। তবু তুমি ওপথ ছাড়।'

'একজনের জন্যে আরেকজনের জীবন বলি দেয়ার চেয়ে যাতে দুজনের জীবনই সার্থক হয়ে ওঠে সেটাই কি বড় কথা নয় উমা? যে সমাজে গায়ক শুধু তার নিজের মর্যাদাতেই বাঁচতে পারে—'

এর পরেই সমাজ-বিপ্লবের কথা এনে ফেলত। অবিকল মেঠো বক্তৃতা—রাম শ্যাম যদু মধু সবাই যা আজকাল বলে, যা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে উমার। কিন্তু মাঠে-ময়দানে যে কথা বলবার, নেতা হয়ে নাম কেনবার জন্যে খবরের কাগজে যে কথা বলা দরকার—সে সব কথা বলে লাভ কি উমার কাছে? তবে কি ভূপেন আজ আর শুধু উমার মন পেয়ে খুশি নয়, সে চায় আরও অনেকের, সম্ভব হলে সারা দেশের মন? উমার দাম ফুরিয়ে গেছে তার কাছে যে-উমা তার জন্যে ছেড়ে এসেছে সব কিছু? না, তা নয়, উমা জানে, আসলে রাজনীতিটা হল বড়লোকের বিলাস, নয়ত নিতান্ত অকর্মন্যদের নিজেদের অক্ষমতার অজুহাত। যাদের কিছুই করার সাধ্য নেই, তারাই শুধু ভেক নেয় রাজনীতির। না হয় হলই রাজনীতি করা অতি মহৎ কাজ, কিন্তু এ ভাবে আত্মবঞ্চনায় লাভ কি? উমাকে পেয়েও কি তৃপ্ত নয়

ভূপেন যে আরেকটা কিছু করার বেপরোয়া নেশায় স'পে দিচ্ছে নিজেকে ? জীবন ব্যর্থ করার মধ্যেই খু'জছে জীবনের চরম সার্থকতা।

'শুধু বর্তমানকে নয়, ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হয় উমা। মানুষ শুধু নিজে বাঁচেনা, তার সন্তানের মধ্যে দিয়েও বাঁচে।'

খেপে গিয়েছিল উমা।—'ও সব বড় বড় কথা ছাড়। শুধু নিজেদের নিয়ে আমরা খুশি থাকতে চাই, কেন তুমি এতে বাদ সাধবে ?'

হেসে ভূপেন বলেছিল, 'কিন্তু তোমার-আমার খুশির ওপরেই তো পৃথিবী চলে না, উমারানী! তুমি-আমি না চাইলেও অনেক কিছুই আমাদের চেয়ে বসে যে! এই সমাজে বাঁচতে হলে সমাজ তার পুরো দাবি আদায় করে নেবে। নেবে কি, নিচ্ছে—দেখছ না ? অবিশ্যি পশুর জীবন গ্রহণ করলে খানিকটা রেহাই—'

'অর্থাৎ আমার জীবন!' ফোঁস করে উঠেছিল উমা। যা নয় তাই বলে ঝগড়া করেছিল। তারপর না খেয়ে ভূপেন বেরিয়ে গেলে কেঁদেছিল সারা দুপুর নিজের জীবনের মহাভুলের আর অশেষ দুঃখের কথা ভেবে ভেবে। এই মানুষটার জন্যে সব কিছু ছেড়ে এসেছে সে!

বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে এলেও মিনু ঘরে ঢুকল কিন্তু অতি সন্তর্পণে। হোক ছ'বছরের মেয়ে, মায়ের মেজাজটা সে ঠিকই টের পেয়ে যায়।

'তুমি এখনো নাইতে গেলে না মা ? বড় মাসি বললে—'

'তুমি পড়তে বসলে!'

'বা-রে, বড় মাসি যে বললে আজ আমারও ছুটি তোমারও ছুটি।'

'বড় মাসি বুঝি আজ আমার হয়ে ইসকুলে যাবে ?' হঠাৎ মেয়ের দিকে চোখ পড়তেই উমা থমকে গেল। দু'বিনুনি করে চুল বাঁধা, চুলে লাল রিবন, মুখে পাউডারের প্রলেপ, চোখে ঘন কাজল। পরনে আধ-ময়লা ছেঁড়া জাঙিয়া। সবাই বলে মেয়েটা নাকি দেখতে হয়েছে মায়ের মত, কিন্তু চোখ দুটি পেয়েছে বাপের। মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়েই থমকে গিয়েছিল উমা।

'আমার সেই লাল জামাটা বের করে দাও না মা।'

উমা জবাব দিল না।

বাপের এত ন্যাওটা ছিল, অথচ মেয়ের জন্যে কত দরদ বাপের! মানুষ

হলে ও কখনও রাজনীতির নামে সংসারের দায় এড়িয়ে এভাবে জেলে পালাত ? পালাতে পারত ? ও জেলে গেলে আজকালকার দিনে একা উমা কি করে সংসার চালায়, ভাবল একবারও সে কথা ? ছাঁটাই বন্ধ করার জন্যে নাকি আন্দোলন শুরু করেছিল ভূপেনরা, কিন্তু বেকার হয়েও যদি সব সময় গান নিয়েই ভূপেন থাকত—দুটো চাকরি করে ব'.যে করে হোক সংসার চালাত উমা, খুশি মনেই চালাত। তাতে সান্ত্বনা ছিল, শান্তি ছিল—মাথা উঁচু করে তাহলে চলতে-পারত। কতকগুলি বদমাইসের পাল্লায় পড়ে বকে যাওয়া বলে মনে হত না স্বামীকে।

'বদমাইস্ !'

'তাছাড়া কি ?' উমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, 'জামাইবাবু আজ এসেছিলেন, সব কীর্তি-কাহিনী তোমাদের ফাঁস করে দিয়ে গেছেন—ছি ছি !'

'কি বললেন তোমার জামাইবাবু ?'

'সব স-ব। বাইরে ভালোমানুষ সাজলেও ভেতরে ভেতরে তোমরা খুনে, কি ভাবে তোমরা দেশের সর্বনাশ করবার জন্যে মতলব করেছ—সব ফাঁস করে দিয়ে গেছেন।'

'তাই নাকি !' সশব্দে হেসে উঠে একটু থেমে নিস্পৃহ স্বরে ভূপেন বলেছিল, 'তবে কি জানো, রকে আড্ডামারা কোন বখাটে ছেলে একথা বললেও গুরুত্ব দিতাম, কিন্তু তোমার জামাইবাবু হলেন গিয়ে—পুলিশ অফিসার !'

'কি, কি বললে !'

'পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কথাটা যে বুঝতে পেরেছ তা তোমার উত্তেজনাতেই স্পষ্ট।'

সত্যি সত্যি উত্তেজিত হয়েছিল উমা, ভীষণ উত্তেজিত। হঠাৎ যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে গিয়েছিল। জামাইবাবু এসে যখন তার স্বামীর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ করছিলেন, তখন অভিযোগের সত্যি-মিথ্যের কথা না ভেবেই সে রেগে গিয়েছিল তাঁর ওপর। হন না আপনার জন, তবু তার স্বামী সম্বন্ধে অপরে কেন যা-তা বলবে ? কী স্পর্ধা ! নিজে সে স্বামীকে যাই বলুক, কিন্তু অন্যের মুখে কেন শুনবে স্বামীর নিন্দে ? আত্মসম্মানে বড়

বেধেছিল উমার। সকলের অমতে স্বেচ্ছায় যাকে স্বামী বলে বরণ করেছে, তার সমালোচনা শোনা যে কী মর্মান্তিক—নিজেরই চরম পরাজয়ের সংবাদ শোনা যেন! কোনমতে ভদ্রতা বজায় রেখে জামাইবাবুকে বিদায় দিয়েছিল।

কিন্তু এখন আবার ভূপেন জামাইবাবুকে অপমান করায় কেন জানি উল্টো রাগ হয়ে গেল ভূপেনরই উপর। অসহ্য রাগ। জামাইবাবুকে তো জানে, পনের বছর পুলিশে চাকরি করলে কি হবে, অমন সাত্ত্বিক মানুষ আর হয় না। পুলিশ অফিসার, কিন্তু কোন বদ নেশা দূরে যাক, পান পর্যন্ত খান না। নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক করে জলস্পর্শ করেন। ঘুষ নেননা বলে আজো তিনি কমিশনার হতে পারলেন না। সত্যি যদি-না ভেতরে কোন খারাপ কাজ করবে ভূপেনরা, কেন তবে তিনি বাড়ি বয়ে এসে তাকে সাবধান করে দিয়ে যাবেন? তাঁকেই কিনা ভূপেন বখাটে ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করল? তুলনা করল কি, আরও ছোটো করল তাদের চেয়ে? অমানুষ ভূপেন! সকলের অমতে ভূপেনকে বিয়ে করে কি ভুলই যে করেছে সে! বুড়ো বাপ-মায়ের মনে ব্যথা দেয়ার এই সাজা, না জানি তার কত জন্মের পাপের শাস্তি! গলায় দড়ি দিয়ে মরা ছাড়া আর গতি নেই উমার! গলায় দড়ি সে দিত, অনেক আগেই দিত, শুধু মেয়েটা আছে বলে!

ভূপেন একটি কথারও জবাব দেয়নি। কোন প্রতিবাদ করেনি। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে পরে অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে অতিশয় শান্তস্বরে বলেছিল, 'মনের মধ্যে যে কথাগুলো জমা হয় উমা, উত্তেজনার মুহূর্তে তাই বেরিয়ে আসে। আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা যে কি স্পষ্ট বুঝলাম। একদিন তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে, সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিলে। কিন্তু ভালোবাসার জন্ম-মৃত্যু আছে! এরপরে আর আমাদের এইভাবে সংসার সাজিয়ে দিন কাটানোর কোন মানে হয় না।'

'সত্যি হয় না। আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে!'

'বেশ, আজই আমি চলে যাচ্ছি, এক্ষুনি!'

'তুমি যাবে কেন, আমিই এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি। এখানে মুখ দেখাবার আর জো আছে আমার!'

'সে তোমার সুবিধেমত যা হয় কর। আপাতত তোমার চেয়ে আমার

যাওয়াই সুবিধে—তুমি মেয়েমানুষ।' দুপুর রোদে বাড়ি ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করছিল ভূপেন, কথা বলতে বলতে ফের জামা গায়ে দিল।

'আমার অবর্তমানে তোমার কোন আর্থিক অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, বেকার পোষার খরচটা অন্তত কমল। তাছাড়া, আমাকে ছেড়েছ শুনলে তোমার মা বাবা খুশি হয়ে হাজার কয়েক টাকাই হয়ত দিয়ে দেবেন—বড়-লোক ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে টাকাটা তো আলাদা করেই রেখেছিলেন শুনেছি।' কথাটা শেষ করেই ভূপেন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে-ছিল। পাশেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল মিনু, কথা বলা দূরে থাক, তার দিকে ফিরে তাকায়নি পর্যন্ত। বাপের সঙ্গে খাবে বলে অত বেলা পর্যন্ত হাঁ করে বসে ছিল মেয়েটা!

সেইদিন সন্ধ্যেয় তার অ্যারেস্টের খবর নিয়ে এসেছিল হাবুল।

মিনু ঠায় দাঁড়িয়ে।

হাতের কাজকর্ম সেরে নিয়ে বাক্স খুলে উমা একটা ফ্রক বের করে দিল।

ভয়ে ভয়ে মিনু আব্দার জানাল, 'ওই লাল জামাটা দাও না মা, বাপি যেটা কিনে দিয়েছিল!'

'ওটা যে ছোট হয়ে গেছেরে।'

মা'র স্বাভাবিক স্বর শুনেই মিনু পিছন থেকে একেবারে তার গলা জড়িয়ে ধরল, 'হোকগে ছোট, বাইরে তো যাব না—দাও মা লক্ষ্মিটি!'

দ্বিরুক্তি না করে উমা জামাটা বের করে দিল। জামা নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল মিনু। মা'র মুখ দেখে আনন্দটা একটু থিতিয়ে এসেছিল, মার স্বাভাবিক দুটো কথা শুনেই সেটা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে।

সত্যি বলতে কি, ভূপেনের গ্রেপ্তারের খবর শুনে তেমন বিচলিত হয়নি উমা, বরং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। ভাগ্যিস সময়মত পুলিশ ভূপেনকে ধরেছে, নইলে তাদের মধ্যে সত্যি সত্যি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে কি করে মুখ দেখাত? এই বিয়ের এই পরিণাম তো জানা কথা—সকলে যখন মুখচোখের ভাব এই রকম করে তার দিকে তাকিয়ে থাকত, কি করে তা সহ্য করত? এ একরকম ভালোই হয়েছে, আপাতত দেড় বছরের মত নিশ্চিন্ত। মনে শোক না জাগলেও স্বামীর জন্যে এখন লোক-দেখানো শোক করা চলবে।

আসলে, মনে কোন শোক নেইও উমার। বরং ভূপেনকে পুলিশে না ধরলেই এই ভেবে তার অনুতাপ হত যে জামাইবাবুর কথা শুনে কতগুলি মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে সে স্বামীকে, আফশোসে হাঁসফাঁস করত মন। এখন তো স্পষ্টই বোঝা গেল, সত্যি ভেতরে ভেতরে ভীষণ রকমের কোন বদ মতলব ছিল ওদের। নইলে কেন ধরবে পুলিশে—যে-পুলিশের বড় কর্তা তার জামাইবাবু?

জেল থেকে চিঠি লিখেছিল ভূপেন, তার সব অপরাধ যেন উমা ক্ষমা করে। অপরাধ সে পৃথিবীতে করেছে মাত্র দুজনের কাছে—উমা আর মিনু—অন্যায় সে কিছুই করেনি। তার নামে যে যে-অভিযোগই আনুক—সব মিথ্যে। অন্যায় নয়, অন্যায়ের প্রতিবাদই সে করতে চেয়েছিল, বেঁচে থাকলে আবার চাইবে। দীর্ঘ দুপাতা চিঠি, কিন্তু সেন্সারে কাটাকুটি করে সে চিঠির আর কিচ্ছু রাখেনি। ভূপেন অন্যায় করেনি বললেই যে উমা তা বিশ্বাস করবে তা নয়, স্বামীর বক্তব্য শোনার জন্যে তেমন কোন উৎকণ্ঠাও তার ছিল না, কিন্তু চিঠিটার আষ্টেপৃস্টে মোটা মোটা কালির দাগ দেয়ায় চিঠিটা আগাগোড়া পড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছিল উমা। একি বিচ্ছিরি কাণ্ড! ভূপেন অন্যায় করেছে, তার সাজাও সে পাচ্ছে, তাই বলে তিন বছরের মেয়ের কাছে লেখা চিঠিটাও এভাবে কাটাকুটি করে মানুষে! পাগল নয়ত ভূপেন যে অ-আ পড়া একরত্তি একটা মেয়ের কাছে এমন সব কথা লিখবে যা পড়ে বিপ্লবী হয়ে উঠে রাষ্ট্রের উচ্ছেদের জন্যে উঠেপড়ে লাগবে সে! এ বাড়াবাড়ি, নিছক বাড়াবাড়ি—বাপের চিঠি পড়তে না পারায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মেয়ের কান্না দেখে আপন মনেই বিড়বিড় করে বলেছিল উমা।

প্রথমে মাস কয়েক নিয়মিত চিঠি দিয়ে গেছে ভূপেন, কিন্তু একটিরও জবাব উমা দেয়নি। সুযোগ পেয়েও জেলে গিয়ে দেখা করেনি তার সঙ্গে। অথচ মাঝে মাঝে সত্যি তার ইচ্ছে হত মানুষটার মুখটি একবার দেখতে—চিঠি পড়লেই মনটা যেন কেমন করে উঠত।

'বাপিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, না মা?'

'হ্যাঁ।'

'বাপিকে কেন ধরল মা?'

'জানিনা।'

'বাপিকে আর ছেড়ে দেবে না মা ?'

এ বড় মারাত্মক প্রশ্ন। দেড় বছরের জেল হয়েছে ভূপেনের, হোক। দেড় বছরের মধ্যে মানুষ অনেক বদলায়। ভূপেনও যে বদলাবে না কে বলতে পারে ? আজকাল চিঠি পড়লেই তো মানুষটাকে অন্য মানুষ বলে মনে হয়—যেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সেই অকৃত্রিম শিল্পী স্বপ্নদর্শী, দুই চোখ মেলে চেয়ে আছে—চিঠির দিকে তাকালেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। হয়ত ভূপেন অত-খানি অন্যায় করেনি, অন্যায় করলে মানুষের কখনও এত মনের জোর থাকে ? হয়ত কোন অন্যায়ই করেনি, ভুল করেছে। ভুল কি মানুষ করেনা ? মানুষই তো ভুল করে—মানুষই ভুল ভাঙায়। উমা শুধু আঘাতই দিয়েছে, শুধু আঘাত দিয়েই ভুল ভাঙানো যায় নাকি মানুষের, অতি আপনার জন যে মানুষ! নিজের ভুল যদি স্বীকার করতে চায় ভূপেন, সব ভুল তার ভাঙিয়ে দেবে উমা। নতুন করে ফের জীবন শুরু করবে।

'পুলিশ কাদের বলে মা ?'

'কাদের আবার, পুলিশ পুলিশকে বলে।'

'পুলিশ বুঝি মানুষ ধরে ?'

'দুষ্টুমি করলে ধরে।'

'বাপি কি দুষ্টুমি করেছিল মা ?'

জবাব দেয়না উমা। সঙ্গে সঙ্গে জবাব ঠিক খুঁজে পায়না।

'পুলিশকে কেমন দেখতে মা ? আমার মত বাচ্চা আছে পুলিশের ?' একের পর এক প্রশ্ন করে যায় মিনু, 'আচ্ছা মা, পুলিশের হাত-পা আছে ? ওরা কোথায় থাকে মা, বনে ?'

কোন কথার জবাব দেয়না উমা। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, 'বাপিকে তোর বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে, নারে ?'

কথা কইতে গিয়ে ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠেছিল মিনুর। হঠাৎ উমার বুকে মুখ গুঁজে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল।

'যাবি তোর বাপিকে দেখতে ? চিঠি লিখে দে, সামনের রোববার তোকে নিয়ে যাব।'

পরের দিন বিকেলে চিঠি এসেছিল ভূপেনের—প্রেসিডেন্সি নয়—বক্সা ক্যাম্প থেকে !

'হ্যাঁরে লক্ষ্মিছাড়ি, আর ঘর গুছোতে হবেনা। এবার যা, স্নানটান সেরে আয়। ওকি, বাক্স খুলে বসে আছিস কেন ?'

রান্না করতে করতে উঠে এসেছেন নিভাননী, 'কি, শাড়ি বুঝি আর পছন্দ হয় না !'

'বয়ে গেছে আমার। তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করে উমা উঠে দাঁড়াল।

'থাক থাক আমার কাছে আর লজ্জা করে না—যা বের করছিলি কর, তাড়াতাড়ি নে।'

'পাগল নাকি, কি দরকার মিছিমিছি একটা কাপড়ের ধোপ ভাঙবার।'

'যত্ত সব ঢং !' নিভাননী এগিয়ে এলেন, 'নোংরা হাত আর লাগাব না—খোল ডালা, দেখি।' জোর করে বাক্সের ডালা খোলালেন, 'ওই যে দেখা যাচ্ছে, ওই, ওই নীলাম্বরীটা—'

'খেপেছ !'

'যা বলি শোন ছুঁড়ি।'

'মরে গেলেও না।' তাড়াতাড়ি একটা শাদা শাড়ি বের করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'বেশি যদি ইয়ে কর নিভাদি তাহলে ওও পরব না।' গামছা সাবান নিয়ে তরতর করে বেরিয়ে গেল।

একবার ঘরে জানালায় এসে বসছে, একবার সদরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে,—ছটফট করছে মিনু।

বসে বসেই শেলাই করলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে উমাও। তাড়াতাড়িতে খেয়াল হয়নি, কলঘরে গিয়ে দেখে কি, ভূপেনের উপহার দেয়া সেই শ্রীনিকেতনের শাড়িটাই বের করে ফেলেছে। শাদা শাড়ি কিন্তু পাড়টি বড় প্রিয় ভূপেনের। নিজের পাঞ্জাবির কাপড় কিনতে গিয়ে নিজের জন্যে কিছু না কিনে নিয়ে এসেছিল এই শাড়িটা। দেখে-শুনে ভীষণ রাগ করেছিল উমা; তাকে বুকে টেনে নিয়ে ভূপেন বলেছিল, 'যাই বলো, এ শাড়ি পরে রাগ করলেও সুন্দর দেখায়। কী সুন্দর আর 'সোবার' পাড় !' ধোপ-ভাঙা সেই শাড়ি আজ তার পরনে। দেখলে ভাববে কি মানুষটা—এই দেড় বছর ধরে বুঝি হা-পিত্যেশ করে বসে ছিল উমা। আর শুধু কি

শাড়ি, বুলু এসে জোর করে সুর্মা পরিয়ে দিয়ে গেল, বিভাদি কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিলেন; শানু না কে যেন অগুরুও খানিকটা গা'ময় ছিটিয়ে দিয়েছে। ছি ছি, এ বেশে কি করে দাঁড়াবে সে ভূপেনের সামনে!

সমস্যাটায় বড় বেশি ভাবিত হয়ে পড়েছিল উমা, সমাধান হয়ে গেল আকস্মিক ও অভাবিত ভাবে। ফিরে এল পাড়ার ছেলেরা। ম্লান মুখে হাবুল এসে দাঁড়াল।

'আবার অ্যারেস্ট করল, স্পেশাল পাওয়ার্সে।'

আস্তে আস্তে শেলাই সরিয়ে রাখল উমা। হাবুলের মুখের দিকে তাকাল। ঘরের মধ্যে সকলে ভিড় করে এসেছে।

'জেলগেটেই অ্যারেস্ট করল। এবার আর কোন বিচার হবে না, কবে ছাড়ে তারও ঠিক নেই। ওয়ারেন্ট নিয়ে তোমার জামাইবাবু এসেছিলেন, বউদি।'

ফ্যাল ফ্যাল করে উমা তাকিয়ে আছে তো আছেই।

'যাওয়ার সময় ভূপেনদা তোমাদের সকলের কথা বললেন, ভাবতে মানা করলেন। আমাদের বললেন, এভাবে ফুলের মালা নিয়ে নয়, পারি তো অন্য ভাবে তাঁকে যেন ছাড়িয়ে আনি!'

কাঁদো কাঁদো মুখে মিনু বলল, 'বাপি এলনা হাবুলকা?'

'না সোনা, তোমার বাপিকে ওরা আবার ধরে নিয়ে গেল।'

'ওরা কারা হাবুলকা, ওরা কারা?' হঠাৎ হাবুলের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল মিনু, চোখের জলে আর কাজলে তার ছোট্ট মুখখানিতে এক কোমল-হিংস্র আভা ফুটে উঠল, 'কারা আমার বাপিকে ধরে নিয়ে গেল হাবুলকা? কারা—কারা?'

উমার ইচ্ছে হল, ঠাস করে এক চড় কষিয়ে সরিয়ে আনে মেয়েটাকে। হাবুলকে ও অমন করে কেন আঁচড়াচ্ছে? হাবুলের কি দোষ?

উমার ইচ্ছে হল, একবার যদি ভূপেন ফিরে আসত, একটি বার শুধু! বলার কত কথাই যে এই মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে জমে উঠেছে!

মেয়েকে শাসন করবার জন্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বুকটা উমার ধক করে উঠল। দেখতে নাকি মায়ের মত,

কিন্তু চোখ দুটি পেয়েছে অবিকল বাপের। শুধু জল নয়, জলের মধ্যেও শীর্ণ একটি আগুনের শিখা ঝকঝক করছে দুই চোখের তারায় তারায়।

হয়ত এটা দেখারই ভুল, তা হোক, মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরল উমা। তারপর সকলকে বলল ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। না, কান্না নয়, নানান ভাবনার টানাপোড়েনে মাথাটা তার ঝিমঝিম করছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। মেয়েকে বুকে নিয়ে, মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে একটু নিরিবিলি ভাবতে চায়॥

সংঘাত

সুলেখা সান্যাল

খুব ভোরে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। কান পেতে শব্দটা একবার শুনে নিল অমিতা, চায়ের কেটলিতে চামচ নাড়ার শব্দ। এ শব্দের অর্থ আজ অমিতার কাছে খুব স্পষ্ট, যদিও প্রথম প্রথম কেমন হতভম্ব হয়ে যেতে হয়েছিল—শেষে সব বুঝতে পেরেছে নিজেই। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, চায়ের কাপে চা ঢালার আগে উঠে পড়তেই হবে। সুকুমার শক্ত করে হাত ধরে থাকে, পাগল হয়েছ, এখনও রাত রয়েছে যে!

—ছাড় তুমি। ভুলে গেছ সব কথা? আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে উপরে উঠে এল অমিতা। বিমলা চুপ করে বসে আছে চায়ের কেটলিটা সামনে করে—হতাশ করুণ ভঙ্গিতে। চাকর ফিরিয়ে দিয়ে গেছে চায়ের কেটলি—ঘুমই ভাঙেনি কারো এখন।

ক্ষেত্র নিজেও বিরক্ত হয়ে উঠেছে, এত সকালে এ বাড়িতে কেউ আবার চা চেয়েছে নাকি? বৌদির সব নতুন। অনেকদিনের পুরনো চাকর কাউকে ভয় পায় না।

অমিতা মুচকি হাসে, এত ভোরে ওঠার সব কষ্ট ভুলে গিয়ে বলে, আসুন, আমরা অন্তত খেয়ে নিই। এখনও সকালই হয়নি ভাল করে—চা না খেলে আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ব।

এমনি চলছে আজ কতদিনঃ প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে বিমলার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে বাঁহাতি ওদের ঘরটা। কখনও থাকে বন্ধ, কখনও খোলা। প্রাণপণ চেষ্টায় বিমলা অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করে তবু কানে আসে টুকরো টুকরো কথা আর হাসি—উচ্ছল হাসি আর কৃত্রিম অভিমান। নিস্তব্ধ হয়ে পাশের সিঁড়িতে একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সশব্দে উঠে যায় সিঁড়ি দিয়ে। একটু পরে নেমে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে, খেয়ে মিটিয়ে দিয়ে তারপর যত খুশি গল্প করতে হয় করুন না। ঠাকুর তো নেই বাড়িতে।

পাংশু হয়ে ওঠে অমিতা। এ ঝাঁঝের সঙ্গে ওর কেমন যেন পরিচয় হয়ে গেছে ক'মাসে। তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে ও।

দুপুরে আবার চোখে পড়ে ওদের বন্ধ দরজা।

বাচ্চা চাকরটাকে বিনা কারণে গালাগালি করে বিমলা, ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে সুখন। কখনও আবার দেড় বছরের ছেলেটার পিঠে গুমগুম করে কিল বসিয়ে বলে, মর্ না হতভাগা! তিনটে গেছে, তোরা দুটো আছিস কি করতে?—সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীরের দিকে চোখ পড়তেই বুকের মধ্যে জ্বালা করে। আবার আসছে আর একটা। গুমরে ওঠে বুকের ভেতরটা, আর ছোট ছেলেটার কান্না বেড়ে যায়। তারপর এক সময়ে হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে আসে অমিতা। ছোট ছেলেটাকে বিমলার কোল থেকে টেনে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়ে। এক মুহূর্ত কেমন অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে গিয়ে আঁচল পেতে শুয়ে পড়ে বিমলা।

এমনি চলছে আজ মাসের পর মাস, দিনের পর দিন।

আশ্চর্য হিংস্র হয়ে উঠেছে বিমলার সমস্ত কিছু।

এরকম কিন্তু ছিলেন না বৌদি, সুকুমার বলে। অমিতা শোনে অবাক হয়েঃ ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন আর শ্রদ্ধা করতেন আমাকে। প্রত্যেকের কাছে আমার প্রশংসা করেছেন!

কই? তোমার সম্পর্কে তো ওঁর অদ্ভুত ধারণা দেখি, মানুষ বলে মনে করেন বলে তো মনে হয় না, অমিতা বিশ্বাস করে না ওর কথা।

পনেরো বছরে বিয়ে হয়েছে বিমলার আর এই দশ বছরে সে ছ'টি সন্তানের জননী। বছরে বছরে কয়েকখানা করে শাড়ি আর গয়নার সঙ্গে ওদেরও উপহার পেয়েছে বিমলা। তাই সে শাড়ি-গয়না তোলাই থেকেছে বাক্সে—পরবার আর সময় হয়নি। আরও একটা জিনিস তার সঙ্গে উপহার পেয়েছিল সে এ বাড়িতে পা দিয়েই, খাটুনি। বিরাট পরিবার, অজস্র লোকের অজস্র ফরমাস, পছন্দ আর মেজাজ, ঠাকুর চাকরের হাতে খাবেনা ওরা কেউ। উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে বিমলাকে। প্রতিটি লোকের মনস্তুষ্টি করে প্রত্যেককে খুশি করে সকলের শেষে স্বামী কি দেওরের পাতের ভুক্তাবশিষ্ট দিয়ে উদরপূরণ। এতটুকু ত্রুটি হবার উপায় ছিল না। অসহ্য রাগী ছোট দেওর ঝোলের বাটি ছুঁড়ে মেরেছে কপাল লক্ষ্য করে, হাসিমুখে

সহ্য করেছে সব ; নতুন করে সেধে এনে খাওয়াতে বসেছে তাকে। শ্বশুরকে কেবল ভয় করা ছাড়া অন্য কিছু জানত না, বিরাট এক ঘোমটা টেনে চারিদিকে তাকাবার অবসর পায়নি, স্বাভাবিকভাবে নির্ভয়ে কথা বলার কথা ভাবতে বুকের মধ্যে শিউরে উঠেছে।

স্বামীর সঙ্গে ক'টা ভাল কথা, ক'টা মধুর কথা বলেছে সে কথা আজ আর মনেও পড়ে না। সে হয়তো ছিল বিয়ের পর ক'টা রঙিন মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আজ আর তার কোন চিহ্ন নেই! শুধু বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আর কোন কথা হয় না। রাত্রে কাজ সেরে যখন ঘরে ফিরেছে স্বামীর পা টিপতে হয়েছে তখন, তারপর পায়ের কাছেই ঘুমিয়ে পড়েছে এক সময়ে। এর মধ্যে অন্যায় কোথায় ছিল, সে কথা অমিতা আসবার আগে কোনদিনই মনে হয়নি বিমলার।

যে দিকে না তাকাবে সে দিকেই বিশৃঙ্খলা, গোলমাল। শাশুড়ি তাকিয়েও দেখেন নি সংসার গেল কি থাকল ; অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল বিমলার। সে ক্ষমতায় কেউ অংশ গ্রহণ করবে একথা ভাবলেও বিরক্ত হয়েছে।

রাত বারোটা পর্যন্ত মেজ দেওর সুকুমারের ভাত নিয়ে বসে থেকেছে, অনুযোগ করেছে, বিয়ে টিয়ে করবেন না? ভাত নিয়ে এমনি করে আর কতদিন বসে থাকব? দেব একটা মেয়ে ঘাড়ে গছিয়ে, বেরিয়ে যাবে দেশের কাজ করা।

এত তাড়াতাড়ি কেন? যাকনা কিছুদিন!—সুকুমার হেসেছিল। বিমলা অন্যমনস্ক হয়ে একটা নিশ্চিন্তভাবে নিশ্বাস্ ফেলে হঠাৎ চমকে উঠেছিল।

কিন্তু শেষপর্যন্ত একটু তাড়াতাড়িই বিয়েটা করে ফেলল সুকুমার, আকস্মিকভাবে। বাড়ির সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করে।

বাপের হুঙ্কার, দাদার রূঢ় সমালোচনা কিছুই তাকে ভয় পাওয়াতে পারল না। যে বংশের ছেলেরা বউ মরে গেলে দুঃখ পাওয়াকে অপৌরুষেয় মনে করেছে, দিনের বেলা বউয়ের সঙ্গে কথা বলা লজ্জাকর মনে করেছে, সেই বংশের ছেলে সুকুমার ভালবাসার জন্যে বাড়ি ছাড়ল।

শ্বশুরের সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল একদিনের মধ্যে। নিজেই চললেন

ওদের ফিরিয়ে আনতে। কিনে আনলেন ফুলের মালা, টোপর; বললেন, তুমিও চল বউমা—দেখে শুনে আনতে হবে।

—আপনি আর মা যান বাবা, আমি এদিকের সব ঠিক করি, কি রকম পাংশু হাসিতে বিমলা জবাব দিল। গাড়ি চলে গেল। শব্দটা মিলিয়ে যেতেই বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল তার।

অমিতাকে দেখে পাথরের মত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। স্বল্পগুণ্ঠনের মধ্যে সংকোচ-কুণ্ঠাহীন একখানা মুখ—পরিণত গাম্ভীর্য আর অভিজ্ঞতায় চিহ্নিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ জিনিস—অপূর্ণতা ঢাকতে বিমলাকে এতটুকু প্রয়োজন হবে না ওর।

আজকাল আর ভাত নিয়ে বসে থাকতে হয় না সুকুমারের জন্যে!

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বিমলা হাসে: আজকাল আর মেজদার ফিরতে রাত হয় না! যত অত্যাচার গেছে কেবল আমারই ওপর দিয়ে। নিজের বেলায় সবাই ঠিক থাকে।—নিঃশব্দ সুকুমারের দিকে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অমিতা। সকলের সামনেও ওর কুণ্ঠা নেই, ঘোমটা টানে না তাড়াতাড়ি শ্বশুরের সামনে, অসংকোচ ওর চলাফেরা, সম্মান দেখানোর ব্যস্ততা নেই…বড় বেশি নির্লজ্জ! সকলের সামনেই সুকুমারের সঙ্গে কথা বলে, হাসে। বিমলা শ্বশুরকে দেখলে এখনও শশব্যস্ত হয়ে ঘোমটা টেনে দেয়—স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না। অমিতা আসবার পরে ওর আরও বেড়েছে সে সব।

অমিতা হাসে: আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করেন দিদি! বাবার গলা শুনলে ওরকম ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কেন? অতবড় ঘোমটা না টানলেও চলে।

—আমরা মুখ্যু মেয়ে, ছোটবেলা থেকে যা শিখেছি তা আর ছাড়ি কি করে? আর ওসব নির্লজ্জপনা আমার ভাল লাগে না, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি—এ আমাদের করতেই হবে।

আহত অমিতা চুপ করে থাকে।

বারান্দায় আলো এসে পড়েছে ওদের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে। স্তব্ধ হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে বিমলা। কী যেন পড়াশুনো করছে ওরা—কখনও হেসে উঠছে। টুকরো টুকরো কথা আর হাসি। বুকের ভেতরটা

কেমন করে ওঠে। এখুনি ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত স্বামীর পা টিপে দিতে হবে। ঘরে ঢুকে শ্রান্ত দেহে ঘুমিয়ে-পড়া স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে ও, নিজের প্রয়োজন ছাড়া তাকে আর স্বামীর দরকার নেই। পাথরের মূর্তির শীতলতা নিয়ে ঘুমোচ্ছে সুরেশ; ঘুমের ঘোরে পাখানাকে এগিয়ে দিয়ে জড়িত স্বরে কি যেন বলে পাশ ফিরে শোয়। আজ বিমলার মাথায় আগুন জ্বলছে; পাখানাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বেরিয়ে আসে ছেড়ে।

—দরজা খোল তো অমিতা, থার্মোমিটারটা নেব।

এক মুহূর্তে থেমে গেল ভিতরের কলগুঞ্জন। দরজা খুলে অমিতা বেরিয়ে এল: থার্মোমিটার তো দুপুরে আপনিই নিয়ে গেলেন দিদি!

তারপর আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে ওরা। নিঃশব্দে ভূতের মত দরজার কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিমলা অনুভব করে, ওরা ক্ষুব্ধ হয়েছে! তারপর সরে আসে দরজা ছেড়ে।

নিচের ঘরে বড় ছেলেটা কাঁদছে। একটু আগে খেয়েছে, তবু আবার খাবার আব্দার ধরেছে। শ্বশুর আর শাশুড়ির হাতের জিনিস ওরা, ওদের কোন কিছুতে বিমলার অধিকার নেই কথা বলার। প্রায় ন বছরের ছেলে, এখনও শিশুর মত আব্দার ধরবে, বাড়িশুদ্ধ লোককে বায়নায় পাগল করে তুলবে অথচ এতটুকু শাসনের অধিকার নেই বিমলার—ছেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার!

ঘরে ঢুকে আজ যেন কথাটা নতুন করে উপলব্ধি করে বিমলা। আগে কিন্তু খুশিই হত ভেবে। তার প্রয়োজন সংসারে পরিশ্রম করতে আর সন্তানের জন্যে—আর কিছুতে নয়। চোখে জল আসে না, চোখদুটো জ্বালা করে। দশ বছরের সমস্ত অভ্যস্ত চিন্তা আর ধারণা বদলে যাচ্ছে বিমলার।

সুকুমারের নাকি চাকরি গেছে, কি সব গোলমাল হয়েছে অফিসে। অত কথা ভাল বোঝে না বিমলা শুধু অবাক হয়ে ওদেরই দেখে—কেমন স্বাভাবিক-ভাবে গল্প করছে, হাসছে। এতটুকু ভাবান্তর নেই—যেন চাকরি যাওয়াটা কত স্বাভাবিক! আজ যদি সুরেশের অমনি হত, বিমলা ভেবে থৈ পায় না। নিজের জন্যে ভাবনা হয় না, হয় বাচ্চাগুলোর কথা ভেবে; আবার একটা আসছে। আবার দুঃখ হয়, রাগও হয়। এই দশ বছরে তার চারিদিকে যেন

নাগপাশের বন্ধন! অথচ কতই বা বয়স তার! মাত্র পঁচিশ বছরে সব কিছু হারিয়ে বসে আছে সে। রাগলে সুরেশ তাকে 'গলগ্রহ' বলে গালাগাল দেয়। সে কথা মনে মনে এতদিন স্বীকার করে নিয়েছে বিমলা, স্বাভাবিক-ভাবেই গ্রহণ করেছে তার ভীরুতাকে ; কিন্তু আজ ভেবে কিসের বিরুদ্ধে একটা আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে—আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে ইচ্ছে করে অলক্ষ্য কাউকে।

হাসে আর বলে : ভালই হল আপনাদের। এখন থেকে দুপুরেও মুখোমুখি বসে থাকতে পারবেন, সেই শুধু বাকি ছিল।

সুরেশ ঘরে শুয়ে ছিল। সেদিকে তাকিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে বলে : যাও না, বেরোও না বাপু ঘর ছেড়ে। দেখতে পারি না ঘরমুখো পুরুষগুলোকে! আঁচলের তলা ছাড়া কি কাজ নেই?

অমিতার সাহস ধীরে ধীরে বাড়ছে। বিমলা লক্ষ্য করছে সেটা অনেক-দিন থেকে।

এ বাড়ির বউরা একা কোনদিন কোথাও যায়নি। ও বেরিয়ে যায় দুপুরে আর ফিরে আসে সন্ধ্যের পর। শ্বশুর পর্যন্ত কিছু বলেন না। রান্না করতে হয় বিমলাকেই। মনের মধ্যে ক্ষোভ জমে, তার বেলায় যত কিছু বাড়াবাড়ি। কোনদিন একা বেরুনো তো দূরের কথা, নিজের থেকে কোনোদিন যাবার নাম করতে পারেনি।

কোথায় যায় অমিতা? বিমলা যদি এত স্বাধীনতা পেত!

কিন্তু কোথায়ই বা যেত সে? সিনেমা থিয়েটার কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি, এ ছাড়া আর কোথায়ই বা যায় লোকে? আর পুরুষেরা যায় চাকরিতে। কিন্তু অমিতা যায় না এসব জায়গায় বিমলা সে কথা খুব ভাল করে জানে। কোথা থেকে ও যেন রোজ জ্বলজ্বলে চোখে ফিরে আসে, সুকুমারের সঙ্গে আলোচনা করে, আর লেখে আলো জ্বালিয়ে।

কী যেন এক সংকল্প নিয়ে রোজ বাড়ি ফেরে অমিতা। বিমলা গম্ভীর হয়ে থাকে।

চাকরি নিলাম দিদি : অমিতা বলে, ওরটা গেল। একজন না চালালে চলবে কেন!

চাকরি? ভাত গলায় আটকে গেছে বিমলার।

—রায়বংশের বউ চাকরি করবে? বাবার সামনে ওকথা মুখেও এনোনা। একেই তো তুমি ট্রামে-বাসে একা একা যাতায়াত কর। সেজন্যে আত্মীয়স্বজনের কাছে কান পাতবার জো নেই।

খিলখিল করে হাসে অমিতা: আরে, বাবা নিজেই তো মত দিলেন, আর এতো ইস্কুলের চাকরি, লজ্জার কি আছে? লেখাপড়া শিখেছি কি পোশাকি কাপড়ের মত তুলে রাখবার জন্যে, কাজেই যদি না লাগল?

বিমলা স্তম্ভিত হয়ে গেছে, বাবা মত দিয়েছেন!

—যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারলে অমত হবার কি থাকতে পারে? বংশ-মর্যাদা নিয়ে গর্ব করার দিন চলে গেছে দিদি। যা দিন আসছে সামনে, আমাদের মত মধ্যবিত্তদের বাঁচতে দেবে নাকি ভেবেছেন?

রাত্রে বুকের ব্যথাটা অসম্ভব বাড়ল বিমলার। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করল। অথচ শব্দ নেই, চোখের কোণ দিয়ে শুধু নিঃশব্দে জল পড়ছে।

অমিতা কাছে এলে পাশ ফিরে শুয়ে বলল: যাও তুমি। শুধু শুধু কেন কষ্ট করবে! কাল থেকে আবার চাকরি আছে!

সুরেশ কাছে গেলে জীবনে বোধ হয় এই প্রথম বিমলা বিদ্রোহ জানাল। ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল: বেরিয়ে যাও তুমি! ভালবাসা দেখাতে হবে না! আমি তো তোমাদের বাড়ির চাকরানী! বিনা মাইনের বাঁদি! আমি তো তোমার গলগ্রহ!...

অস্ফুট করুণ সুরে বিমলা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে। অমিতা মাথার কাছে বসে, বলে: এই সামান্য ব্যাপারে কাঁদছেন? চাকরি গেছে, আবার হবে। এর জন্যে দুঃখ করার কি আছে?

—কিন্তু শুধু শুধু ওঁর চাকরিটা কেন গেল? উনি তো ধর্মঘট করেন নি? এত বছরের পুরনো কাজ—।

অমিতা হাসে: ওদের কাছে যোগ্যতার কোন দাম নেই দিদি। ওরা শুধু নিজেদের লাভটুকু বুঝে নিয়ে কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয় বিশ্বস্ত লোকগুলোকে। নইলে বড়দা তো কোন রাজনীতির মধ্যেই ছিলেন না, তবু দেখুন ওঁকেও ওরা তাড়িয়ে দিল। এমনিই ওরা— কাউকে বাঁচতে দেবে

না। দেশের লোক আশা করে আছে আর ওরা এমনি করেই আমাদের বাঁচাচ্ছে!

বিমলা চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসে : তাহলে আবার চাকরি পেলে, আবারও তো তাড়াতে পারে?

—পারেই তো! ওরা চায় সবাই ওদের হয়ে দালালি করুক। যারা ওদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে তারাই ওদের শত্রু— দেশদ্রোহী।

—দালালি?...মানে?

—মানে, যাদের ওরা ভয় পেয়ে তাড়িয়ে দেবে, তাদের বদলে একদল লোক টাকার লোভে চোরের মত ওদের খোশামোদ করে কাজ চালু রাখবে। সেইজন্যেই ওঁর চাকরিটা গেল—ওদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে। আমার ইস্কুলের চাকরি—সেটাও হয়তো যাবে। শিক্ষা দেওয়া—সেখানেও ওরা চায় দালালি।

বিমলা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে : এরাই আবার আমাদের বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছে! অমিতা ম্লান হাসে।

বিমলার চোখ দুটো এখন শুকিয়ে গিয়ে কর্ কর্ করে।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরল না সুকুমার। বাড়া ভাতের সামনে বসে ঢুলছিল বিমলা, চমকে জেগে উঠল যখন অনেক রাত্রে অমিতা বাড়ি ফিরল— একা। বিমলা শুনল, সুকুমার এখন কিছুদিন বাড়িতে থাকবে না। শুনল, অফিসের মালিক শুধু তার চাকরি খেয়েই নিশ্চিত হতে পারছে না, ইউনিয়নের নেতা সুকুমারকে জেলে পোরাও নাকি বিশেষ দরকার তাদের! আফসোসে, ক্ষোভে, রাগে ডাক ছেড়ে কাঁদতে গিয়েও অমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল বিমলা।

আরও একটা অঘটন ঘটে গেল। একদিন ভোরবেলা পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল—অমিতাকে। সমস্ত বাড়িটা ওরা তছনছ করে ফেলল একঘণ্টার মধ্যে—বিমলার রান্নাঘর পর্যন্ত বাদ গেল না। বিরক্তিতে আর ঘৃণায় আর ভয়ে বিমলার গা শিরশির্ করে—ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে ও। অমিতা আশ্চর্য গাম্ভীর্য নিয়ে চলাফেরা করে, বিমলা অবাক হয়ে যায়।

অমিতা চলে গেলে আর এক পশলা কাঁদল বিমলা। সেটা নিরুপায় দুঃখের কান্না নয়—অনুতাপ আর ক্ষোভের বুক পোড়ানো কান্না। এবার

আর সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। রায় বংশের যে বউ চাকরি করবে শুনে একদিন বিস্ময়ে গলায় ভাত আটকে গিয়েছিল বিমলার, আজ তার জেলে যাওয়া দেখেও এতটুকু বিস্ময় জাগল না—অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল ওরা—অন্যায়? হ্যাঁ, সুকুমারের, সুরেশের আর ওদেরই মত হাজার হাজার লোকের চাকরি যাওয়ার অন্যায়, এই অসহ্য অভাবের অন্যায়···কেঁদে কেঁদে নিজেই এক সময় চুপ করে গেল বিমলা।

সংসার অচল। কোনমতে টেনে টেনে চলছে। বিমলা যেন কেমন হয়ে গেছে আজকাল, কি যেন ভাবে দিনরাত।

রাত্রে সুরেশ খবরটা দিল: চাকরি পাচ্ছি একটা, জানো!

—কোথায়? নিস্পৃহস্বরে বিমলা জিজ্ঞেস করে।

—পার্মানেন্ট নয় যদিও। অফিসে সব স্ট্রাইক করে আছে, তাই তাদের বদলে কিছুদিনের জন্যে কাজ করতে হবে। মোটা টাকা দেবে, পুলিশ দিয়ে গাড়ি করে অফিসের ভেতরে পৌঁছে দেবে আবার বাড়ি দিয়ে যাবে—আরও অনেক সুবিধে।

হঠাৎ আহত বাঘের মত গর্জন করে উঠল বিমলা: কি বললে? দালালি করবে তুমি? সে টাকা আমি ছোঁব?···তুমি না বড় ভাই সুকুমারের—দাদা? অমিতা এর জন্যে লড়াই করে জেলে গেল, আর তুমি—? কান্নায় গলার স্বর আটকে আসে বিমলার: কত টাকা চাই তোমার? এই নাও, এই নাও···। আলমারি খুলে সমস্ত গয়না স্তম্ভিত সুরেশের পায়ের কাছে বিমলা একটা একটা করে ছুঁড়ে ফেলে। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে সেগুলো। তারপর ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

ওদের ঘরটা খোলা পড়ে আছে। এতক্ষণের আটকানো কান্না এবার সেদিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। বিমলা কাঁদে। বেশ ছিল সে এতদিন চোখ বুঁজে, কিছু না বুঝে—কেন অমিতা তাকে দুঃখের মধ্যে এমনি করে জাগিয়ে দিয়ে গেল।

আজ কাল পরশু

মিহির আচার্য

Capitalism violates the world as a senile old man violates a young, healthy woman whom he is impotent to impregnate with anything besides the diseases of senility. —*Gorky*

মাসাধিককাল ধরে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন সত্যেনকে উৎপীড়িত করছে। স্বপ্নের চেহারাটা এইরকম : একটি জরদ্‌গব বৃদ্ধ যুবতীকে ধর্ষণ করছে।

এবং আরো আশ্চর্য, সত্যেন এই স্বপ্নদৃশ্যটি প্রত্যক্ষদর্শীর মতন হুবহু বর্ণনা করতে পারছে। অথচ ধর্ষণ সে দেখে নি, সে সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতাই তার নেই। অবশ্য পিকাসোর ক্লাসিক ছবি 'রেপ' সে এক ধনীবন্ধুর বাড়িতে দেখেছে। তার সঙ্গে ওর স্বপ্ন-দর্শনের কোনো মিল নেই।

এই তো এখন চোখ বন্ধ করে ঘরে শুয়ে আছে, আর সেই সুযোগে সমস্ত দৃশ্যটা সে আনুপূর্বিক দেখতে পাচ্ছে।

বৃদ্ধের দন্তহীন মুখ থেকে লালা বার হচ্ছে, ঠোঁটের কিনারে জমা থুতু, অক্ষিগোলক যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে, সমস্ত শরীর গ্রীষ্মের কুকুরের মতন ভয়াবহ ওঠা-নামা করছে, আর দেহ-গলা ঘাম, ঘামের নদী।

বুকের তলায় যুবতী মেয়েটি, নগ্নদেহ, বৃদ্ধের স্বেদে জবজবে বাসী ভিজে জবাফুলের গন্ধ, ঈষৎ বিস্ফারিত অধর, নিশ্বাস নিয়মিত পড়ছে কিনা বোঝা যায় না। আশ্চর্য যৌবনসমৃদ্ধ শরীর, কঠিন স্তনচূড়া, বিবৃত জঙ্ঘাপ্রদেশ, ভারি নিতম্ব, ঈষৎ স্ফীত নাভিমূল।

এই বিচিত্র দৃশ্যটি সত্যেনকে অহরহ প্রেতের মতন তাড়া করছে। অথচ এ-স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা নিজের কাছে খুঁজে পাচ্ছে না। তার নির্জ্ঞান মনের কোনো বঞ্চিত কামনার ছবি বলেও সে মনে করে না।

কারণ সত্যেন প্রথমত বৃদ্ধ নয়, ত্রিশের শিক্ষিত রুচিশীল যুবক। যদিচ সে এখনো অবিবাহিত তার কারণ সময়াভাব। একটা গবেষণার কাজে সে গভীরভাবে নিযুক্ত।

তার পরিচিত দু'একজনকে এ-দৃশ্যটা সে বলবে ভেবেছে, কিন্তু পারে নি। ভাবতে গেলে সমূহ বিষয়টা এত কুৎসিত যে রুচিবোধে আটকেছে।

এতদিন মনে করছিল সময়ে এই বিশ্রী ঘটনার ব্যাপারটা সে ভুলে যেতে পারবে। কিন্তু চেষ্টা করেও সে ভুলতে পারল না। বরং বিষয়টা ক্রমশ জটিল হতে লাগল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সত্যেন স্পষ্ট মনে করতে পারল : এই বৃদ্ধকে সে দেখেছে। এবং কয়েকশ বছর ধরে দেখছে। নিজের ব্যক্তিগত কাজকর্মে ডুবে থাকার জন্যে সব সময় মনে থাকে নি। 'কয়েকশ' বছর ধরে' কথাটা কেমন তার নিজের কানেই বেসুরো শোনাল। না : নিজেকে সে জাতিস্মর ভাবে না। তবে সে বুদ্ধিমান যুবক একটা যুক্তি উদ্ভাবন করতে পারে। যেমন : একেকজনকে দেখলে মনে হয় যেন কতযুগের চেনা!

এই বৃদ্ধ তার তেমনি স্পষ্ট পরিচিত।

এর একদিন যৌবন ছিল, যেমন সব মানুষের থাকে। এবং সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্যস্বরূপ এই মহিলা তার অনেকগুলি সন্তানের গর্ভধারিণী।

এই ভদ্রলোক সেদিন অযুত বাহুবলের সাহায্যে নিজস্ব একটি ভুবন গড়ে তুলেছিল। এই পৃথিবীকে যেই দেখেছে সৃষ্টিকর্তার তারিফ করেছে। তার বিপুল ঐশ্বর্যের ভাঁড়ারের চাবি ছিল তার হাতে।

সত্যেন বেশ স্পষ্ট মনে করতে পেরে উৎসাহিত হচ্ছে।

তারপর বোধহয় শক্তির নেশায় ঘুন ধরল। ওই ভদ্রলোকের তখন মধ্যবয়স।

এরপরের ঘটনা আশ্চর্য জলদ্গতিতে বদলে গেল।

একদিন দেখা গেল লোকটি কেবল শয্যায় নিদ্রাসুখ দিচ্ছে, মার্জারের মতন ঝিমোচ্ছে। এবং কখন একদা তার সঞ্চিত শক্তিরাশি দেউলে হয়ে গেছে।

সেই সময়ই এই চূড়ান্ত দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল।

এক গভীর রাত্রিতে তার ভাঁড়ারের চাবি চুরি গেল। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দেখল ভাঁড়ারের সমস্ত চুরি গেছে।

পর পর বউ মরল। পটপট করে ছেলেমেয়েরা মরল। আর, ওই লোকটা পাগল বনে গেল।

তার ভাঁড়ারের ঐশ্বর্য নিয়ে তস্করেরা কোথায় গেল? সেই দস্যুদলের গতিবিধি অনুসরণ করেছে সত্যেন। দূরে বহুদূরে তারা আকাশের তলায় শিবির পেতেছে। অসুরের মতন একদল মানুষ খাটছে। উঁচু উঁচু ঢেউ-তোলা ছাউনি রচনা করেছে, আর ছাউনি ফুঁড়ে নলের মতো দাঁড়ানো হাঁ করা মুখ। সে-মুখ ড্র্যাগনের মতন অগ্নি উদ্গার করেছে। আগুনের কালো ধোঁয়ায় আকাশ মসীমাখা।

ছাউনির কিছু দূরে মৃত্তিকা, তার মুখ বিদীর্ণ, আর মুখ থেকে টেনে বার করা হচ্ছে রাত্রির মতন কালো অন্ধকার। আর একটা বেরুচ্ছে পুঁজের মতন তরল পদার্থ।

দস্যুরা ওই লোকটির ভাঁড়ার চুরি করে এই সমস্ত রাজসূয়ের আয়োজন করেছে।

তারপর ওই লোকটি একদিন দেখল কাতারে কাতারে মানুষ বন্যায় ভেসে যাওয়া কুটোর মতন কোথায় ছুটছে। তার ভুবন বিজয়ার মণ্ডপের মতন খাঁ খাঁ করছে।

উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারার মতন একদিন সেও জনস্রোতে ভেসে এল।

দেখল সেই ছাউনি, সেই অগ্নিবমনকারী আকাশস্পর্শী নল। সেই মৃত্তিকাগর্ভের অঙ্গার, আর তরল পুঁজ। এগুলি যে তারই ঐশ্বর্য থেকে ছিনিয়ে নেয়া বুঝতে পারল না।

মধ্যবয়স এবং অভিজ্ঞ দেখে দস্যুরা তাকে কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করল। লোকটা পরের সম্পত্তিকে নিজের বলে মনে করে রক্ষণা-বেক্ষণ করতে লাগল।

এখানেও এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠেছে। নতুন নতুন বসতি। নতুন নতুন মানুষ। পাকা মজবুত ইমারত গড়ে উঠল। ইমারত ছাড়িয়ে একটু দূরে ব্যারাকের সঙ্গে ভাটিখানা। ভাটিখানার গায়ে ছেনাল মেয়েমানুষ। যেন দিনান্তের খাটনির পর কালোকোলো মানুষগুলো একটু বিশ্রাম পায়, সন্তোষ পায়। কিন্তু পাপকে তো উলঙ্গ করে দিলে চলবে না। তাই ত্রিশূলমার্কা গম্বুজ ধরনের বাড়ি বানাতে হল। সেখানে সারা সপ্তাহের পাপ

ধুয়ে ওরা আবার পরের সপ্তাহের জন্যে পাপে নোংরা হতে পারবে। আর যারা নাচ গান ভালোবাসে তাদের জন্যে মৃদঙ্গ-শ্রীখোলেরও বন্দোবস্ত রইল।

একদিন একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। লোকগুলো ভাটিখানায় গেলনা, কী-এক দুর্বোধ্য গান গাইতে গাইতে দলবদ্ধ পা ফেলে ছাউনিতে এসে ঢুকল, আর তালাগুলি দিল বন্ধ করে।

কী ব্যাপার ?- ছুটে এল লোকটি।

ওরা বললে ঃ চাকা আর ঘুরবে না।

কেন, কেন ?

রোটি দাও। চারখানা রোটিতে পেট ভরে না মাশায়।

লোকটি চিৎকার করে বলল ঃ অধম্ম হবে। ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না তোদের। নে, হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরের কাছে মার্জনা ভিক্ষে কর।

ওরা ঘোঁত ঘোঁত করে বললে ঃ ঈশ্বর ব্যাটা কটা রোটি খায় ?

চুপ, চুপ অভিশাপ লাগবে, মূর্খের দল—

আমাদের মূর্খতার ওপরে তোমরা টিকে আছ।

চুপ চুপ।

হাটে গম নেই।

আকাশে বৃষ্টি নেই।

আমাদের ঘরে আগুন নেই।

কয়লা বাড়ন্ত।

তোমরা দশ জাহাজ গম কয়লা নিয়ে মাঝগাঙে গেছ। জাহাজের খালাসীরা ফিরে এসে বলেছে তোমরা গম কয়লা গাঙে ঢেলে দিয়েছ।

কে ? কে বললে ? তার জিভ খসে পড়বে।

চাকা ঘুরবে না। ঘুরবে না।

তত্ত্বাবধায়ক ছুটল গলফ্ ক্লাবে যেখানে ওরা খেলছিল। হুজুর, বিপদ। ওরা চাকা বন্ধ করে দিয়েছে।

দিক।

দিক। আশ্চর্য হল লোকটা।

আমাদের স্টোরে অঢেল মাল। আমরা চালিয়ে যেতে পারব। ওরা

পারবে না। রুজিতে টান পড়বে, পেট জ্বলবে। আবার নিজেরাই ওরা চাকা ঘোরাবে।

কিন্তু চাকা ঘুরল না।

এরা অবাক ঃ ওরা ক্ষুধা জয় করেছে।

তাহলে চাকায় একটু তেল দিয়ে দাও। পিছল হবে।

তেল!

হ্যাঁ ঃ সাড়ে চারখানা রুটি, আর-এক টুকরো কয়লা।

চাকা ঘুরল।

তারপর একদিন মানুষগুলো দেখল আর একটা লোহার ইমারত গড়ে উঠল। আর, লোহার শিরস্ত্রাণ-পরা একদল সিপাহী দিনরাত কুচকাওয়াজ করতে লাগল।

এরা কী করবে?

অধার্মিক ইবলিসদের সৎপথে ফেরাবে।

লোকটির তন্‌খা বেড়ে গেল।

সত্যেন বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল ঃ লোকটা ক্রমশ তার সম্পদ হারানোর দুঃখ ভুলে গেল! এবং বর্তমান কাজটাকেই সে একমাত্র ধ্রুব বলে জ্ঞান করল।

একসময়ে সে হুজুরের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকেও অভিন্ন বলে চিনতে শিখল। সে যে পরের বাগান পাহারা দিচ্ছে এ চেতনাও তার রইল না। লোকটিকে ওরা খাতিরযত্ন করে, শুধু খাতির নয়, তন্‌খার পরিমাণও বাড়ে। লোকটি শৌখিন হয়, গোঁফে সুগন্ধি মাখে, হাতে ফুলছড়ি, আর বার্ডস-আই খায়। অবশ্যই এই সৌভাগ্যকে সে তার যোগ্যতার পুরস্কার বলে ভাবে।

সত্যেন এক যুগ ধরে এই সকল পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করেছে। তার নোটবইয়ে লিখে রেখেছে।

আর সবচেয়ে বিস্ময় জেগেছে ওই লোকটিকে দেখে। কেমন বয়সটাকে মধ্যসীমায় আটকে রেখেছে। বাইরে থেকে কেউ ওকে বুঝতে পারে না ওর আসল বয়স কত। ঝুনো নারকেলের মতো নির্দিষ্ট আকৃতিতে শক্ত হয়ে দানা বেঁধে গেছে।

লোকটা বার্ডস-আই খায়, ফুলছড়ি নিয়ে হাঁটে। কানে-গোঁজা তুলোয় আতরের গন্ধ।

ওর বউ মরেছে, ছেলে নেই, সে-সব স্মৃতি আর তার মনে দাগ কাটে না। বরং সে এখন বিশ্বাস করে ঃ ওদের এই আত্মত্যাগ সার্বিক মঙ্গলের জন্যে। এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নি, সেটাও আর-এক ধরনের ত্যাগব্রত বইকি। সে এখন একটা ব্যক্তিমানুষ, ছোটোখাটো সুখদুঃখ সে জাগতিক হিতের কারণে বলি দিয়েছে। এবং সে আশা করে জগৎ তার এই আদর্শ গ্রহণ করবে।

মাঝে মাঝে তাকে বক্তৃতা দিতেও যেতে হয়। ফোটোগ্রাফার হরেক পোজে ছবি তোলে। কাগজে সে সব ছবি বেরোয়। একথা সে বুঝেছে রোজই একটা-না-একটা ওজুহাতে তার ছবি কাগজে বের করতে হবে। যাতে সাধারণের সামনে তার উপস্থিতিটা অভ্যাসে পরিণত হয়। এটা বড় দরকারি।

এ সকল ব্যাপারের সমন্বয় করতে-করতে সে অদ্ভুত এক আজাদীর স্বাদ পায়। এবং কী করে নিজের শক্তিকে অত্যন্ত বৃহৎভাবে অনুভব করে।

সত্যেন বেশ মনে করতে পারে। এই সকল সন্ধান-সূত্র সে তার নোট-বইয়ে পরিশ্রম করে টুকে রেখেছে।

তারপর যুগসন্ধিক্ষণে এক গোধূলিলগ্নে হঠাৎ আকাশটা লাল হয়ে উঠল। দিগন্তে বারুদের গন্ধ। সমুদ্রের নীল জল উথাল-পাথাল।

একটা প্রকাণ্ড-শরীর ঈগল হঠাৎ ডানার পাখসাটে সমস্ত বায়ুস্তরকে মথিত করে উঠল।

আর, দ্যাখো দ্যাখো, সেই গানের আওয়াজে সমুদ্রের জল তাণ্ডবনৃত্য করতে-করতে ধেয়ে এল। অরণ্যের পাইনগুলো পায়ের শিকল ভেঙে ঊর্ধ্বে বাহু মেলে এগিয়ে এল। বিরাট পাহাড় তার জল-প্রপাত বুকে নিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল।

উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম চারদিক থেকে প্রাচীর তুলে একযোগে ওরা ধেয়ে এল।

প্রত্যূষে উঠে ওরা দেখল প্রাচীরের চাপে তাদের ইমারতগুলো আর্তনাদ

ভুলে কাঁপছে। লোহার শিরস্ত্রাণ ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল। আর গম্বুজের ত্রিশূলের ধার ঘেঁষে বিরাট ফাটল।

ইমারতের কক্ষে ডাক পড়ল তত্ত্বাবধায়কের।

ওরা বলল : আমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে এই শিবির।

লোকটি বললে : হুজুর তাহলে এদের কি হবে ? এদের ভার কে নেবে ?

ওরা বললে : সব ভার তোমার ওপর দিয়ে যাব। ওরা তোমাকে চেনে। চেষ্টা করলে তুমি 'ওদের লোক' হতে পারবে।

লোকটি বললে : ওরা আমাকে মানবে কেন ?

মানবে। এই নাও আমাদের বেটন। আমাদের সাধের বেটন তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। কিন্তু মনে রেখো, যে সমস্ত ব্যবস্থা আমরা এতদিন পাকা করে রেখেছি তা যেন ঠিক থাকে। রদবদল করবার চেষ্টা কোরো না। কারণ এটা জেনো তোমার শক্তি আমরাই, ওই কালোকোলো মানুষগুলো নয়।

এক মধ্যরাত্রির অন্ধকারে লোকটির হাতে স্টোরের চাবি দিয়ে ওরা ডুবো জাহাজে করে পাড়ি দিল।

পরদিন স্টোরের চাবি খুলে লোকটি দেখল : শূন্য ভাণ্ডার। কতিপয় ধাড়ি ইঁদুর মেঝেতে দাপাদাপি করছে। কেবল একটি রুম থেকে বেরুল স্তূপাকার কিছু অব্যবহৃত সম্পদ।

রাইফেল ৩০ হাজার, ১০,০০,০০০ কার্তুজ, ১০,০০০ হাতকড়া, ৫০০ টিয়ার গ্যাসের শেল, ৭০০ লোহার শিরস্ত্রাণ। আরও কিছু রাবার গুডস— গোল্ডডলার, গোল্ডকয়েন, থ্রি নাইটস্।

উত্তরাধিকারসূত্রে এই সম্পদগুলি অর্জন করল লোকটি।

তারপর পূর্ণোদ্যমে চাকা ঘুরতে লাগল।

এবং যাতে কালো লোকগুলো কাজে প্রচুর উৎসাহ পায় মাইকে গানের ব্যবস্থা হল। উচ্চাঙ্গের গান, রামধুন জাতীয়। অনর্গল বক্তৃতার টেপ রেকর্ডিং ওদের কানের কাছে বাজতে লাগল। 'দোস্ত, বন্ধুগণ—কর্মই নারায়ণ কর্মের চেয়ে পবিত্র বস্তু আর কিছু নেই। দেখ বন্ধুগণ জমানা বদলেছে আগের দিনের মতন চাকা বন্ধ করা চলবে না। এখন তোমাদের শ্রম মানে

দেশের সম্পদবৃদ্ধি। দেশ মাটি নয়; মানুষ। এখন গঠনমূলক কাজ করতে হবে, দেশকে গড়তে হবে। ভাঁড়ার শূন্য। লক্ষ্মীকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।'

চাকা বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে লাগল।

দীর্ঘ বিশ বছর ধরে কাঁচা মালে দেশ ছেয়ে গেল।

দু'একজন নিন্দুক গুনগুন করে উঠল: এত কাঁচামালে কী হবে? এগুলোকে শিল্পে রূপ দেয়া দরকার।

লোকটি নিন্দা শুনে চমকে উঠল। ইমারতে ফিরে নাকে চশমা দিয়ে আবার চুক্তিপত্রটা আলোয় তুলে ধরল। সর্বনাশ! শিল্প মানেই দেশের সমূহ ক্ষতি। আমাদের আরো, আরো কাঁচা মাল উৎপন্ন করতে হবে।

কাঁচামাল কোথায় যাবে? ভিন্‌দেশে। অবশ্য আবার ফিরে আসবে শিল্পের উজ্জ্বল আকারে ঝলমল হয়ে।

'বন্ধুগণ জেনো শ্রমের বিভাগ আছে। কোনো শ্রমই ছোটো নয়। আমরা ক্রমাগত কাঁচামাল তৈরি করে ভিন্‌দেশে পাঠাব। পরিবর্তে ঘরে বসে তৈরি শিল্প পেয়ে যাব।'

এবং—

'ভুলে যেওনা, আমাদের দেশ কাঁচামালের বাজার। আমরা এর জন্যে গর্বিত, আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্য।'

লোকটি চুক্তিপত্রের চার নম্বর অনুচ্ছেদটি আবার পড়ল।

ইদানিং লোকটির কাজ বাড়ল। দৈনিক পাঁচটা উদ্বোধন, বক্তৃতা, সাক্ষাৎ-কার, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, রেডিও ভাষণ।

প্রবলবেগে দেশ এগোতে লাগল।

আর দেশের শোভাও বাড়তে লাগল। মাঠকোঠাগুলোকে ঢেকে ফেলে আকাশচুম্বী দালান উঠল। চওড়া মসৃণ রাজপথ। আলোর প্রপাত।

যে দেখল সে-ই স্বীকার করল: নিঃশব্দ রক্তপাতহীন বিপ্লবই বটে।

এরপর একদিন ঘুম থেকে উঠে আয়নায় দাঁড়িয়ে লোকটি আবিষ্কার করল সে বুড়ো হয়ে গেছে। চুল শনের মতন শাদা, দাঁত পড়েছে, গায়ের চামড়া শ্লথ, চোখে ছানি।

এত শীঘ্র কী করে সে বৃদ্ধ হয়ে গেল। রোজ ভোরে একটা আস্ত কাঁচা

বেল খায়। আগে আস্ত দুটো মুরগির রোস্ট খেত। কিছুদিন ডাক্তারি পরামর্শে আমিষ বাদ দিয়েছে। ফলমূল তার আহার। আর ছাগিদুগ্ধ সারা দিনে সের দুয়েক মাত্র।

অথচ কত কাজ বাকি। কতকগুলি যোজনার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্টোরের দিকে এগিয়ে এল লোকটি। ভেতরে পা দিতেই অবাক।

এ কী! ওদের ফেলে রাখা সেই সম্পদগুলি কোথায়!

স্টোরকীপার বললে : সার্, ওগুলো তো ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্যবহার করা হয়েছে!

এত রাইফেল, কার্তুজ, টিয়ারগ্যাস, হাতকড়া, রাবার-গুডস্ সব ব্যবহার করা হয়েছে!

হ্যাঁ সার্। আপনার নির্দেশমত কাজ হয়েছে। গড়ে আমরা দৈনিক ছ জন করে লোককে শাসন করেছি, দৈনিক ত্রিশটা করে কার্তুজ ব্যবহার করেছি, হাতকড়াও দুডজন করে কাজে লাগানো হয়েছে।

আর, আর এই রাবার-গুডস্ ?

আপনার প্রয়োজনেই লেগেছে দশ প্যাকেট। বাকি অজ্ঞ লোকদের ব্যবহার করতে বাধ্য করেছি।

স্টোররুম থেকে দ্রুত ফিরে এল লোকটি।

আপনকক্ষে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসল। এখন তাকে গম্ভীর চিন্তাশীল দেখাল। অনেকক্ষণ সে চিন্তা করল, কিন্তু কী যে চিন্তা করল নিজেই মানে করতে পারলনা।

বাইরে প্রচণ্ড নিদাঘ। লু বইছে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণটি কিছুক্ষণ আগে যান্ত্রিক গোলযোগে বিকল হয়ে গেছে।

লোকটি বিবস্ত্র হয়ে বাথ-টবে গিয়ে বসল। গায়ে ঠাণ্ডা জল ছুঁড়ল। শরীর শীতল হয় না। সারা শরীর বৈশাখের প্রান্তরের মতন জ্বলছে। অস্বচ্ছ চোখে মনে হল দিগন্তে ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে আকাশে উড়ছে। মস্তিষ্কের ভেতরে কী রকম হু হু বাতাস, হৃৎপিণ্ড ওঠানামা করছে।

কাঁপতে কাঁপতে লোকটি উঠে দাঁড়াল। আপাদমস্তক জল ঝরছে। যেন সদ্য জল থেকে তোলা একটা রাঘব বোয়াল।

লোকটি উচ্চকণ্ঠে হাঁকল ঃ কে আছিস ?

খাস ভৃত্য ছুটে এল।—হুজুর।

লোকটি বললে ঃ আমার বাঁশি নিয়ে আয়। আমি এই যমুনাপুলিনে বাঁশি বাজাব।

ভৃত্য বাঁশি এনে দিল।

লোকটি চিৎকার করে উঠল ঃ বেতমিজ। উল্লুক।

হুজুর।

এ বাঁশি শোনাব কার কাছে। এই বিপিন যমুনাপুলিনে—

ভৃত্য দ্রুত প্রস্থান করল।

দরজায় পদশব্দ।

এসো, এসো সখি। বাঁশি ধরো, মালা পরো।

কষ্টিপাথর ছেনে একটি শক্ত কঠিন মূর্তি। নিতম্ব আবৃত কালো চুলের বন্যায়। কঠিন ত্রিশূলের মতন ঈষৎ স্তোকনম্র স্তনচূড়া, স্ফীত উচ্ছ্রিত নাভিদেশ, কৃশ কটি, এবং প্রশস্ত শ্রোণীদেশ।

কী নাম তোমার ?

সীতা।

সীতা! সে তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। আর এতো পঞ্চবটী বন নয়, এ যমুনাপুলিন। তুমি আমার দুরন্ত রাধা।

আমি সীতা।

লোকটি চোখের সামনে দেখল মেয়েটার শরীরটা একটা উঁচু দেয়ালের মতন ওর দৃষ্টিকে আটকে দিয়েছে। তারপর মনে হল দেয়াল নয়, প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখা আর গুচ্ছগুচ্ছ মুকুলে ছাওয়া একটা বৃক্ষের মতন মন্দমন্দ বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। আর, তীক্ষ্ণ বর্শার মতন অসংখ্য সূর্যকিরণ ওর অঙ্গে ঝলসাচ্ছে।

মেয়েটি বলল ঃ সাহেব তুমি আমার বাপ।

লোকটি বললে ঃ তোর ছেলের বাপ হতে ইচ্ছে করি। আমার উত্তরাধিকার নেই, আমার শোণিতের ধারা আমি তোর মধ্যে দিয়ে বহন করে দিতে চাই।

মেয়েটি বলল ঃ সাহেব তুমি তা পারবে না। তুমি বুড়ো হয়ে গেছ।

তারপরই স্বপ্ন-দৃশ্যটি সত্যেনের চোখে আন্দোলিত হয়ে উঠল।

সে দেখল বৃদ্ধ লোকটির দাঁত-জোড়া মেঝেতে ছিটকে পড়েছে। দন্তহীন মাড়ি থেকে লালাস্রাব, ঘন আঠালো থুতু। মেয়েটির মুখ গলা বুক লালায় থুতুতে ভরে উঠেছে। অস্বচ্ছ কোটরে-ঢোকা বৃদ্ধের অক্ষিগোলক গোল হয়ে বেরিয়ে আসছে, হাপরের মতন বুকটা ওঠানামা করছে। আর, ঘামের নদীতে ভাসছে।

এরপরই স্বপ্ন-দৃশ্যটি ছিঁড়ে গেছে। সত্যেন আর স্বপ্নটাকে বিশদ করতে পারে নি।

একশো-কি দুশো বছর পর অশনি নামে আর-এক যুবক স্বপ্ন-দৃশ্যের একটি ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছিল। অবশ্য তখন দৃশ্যটি স্বপ্ন ছিল না, নিকট বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

এখনো শহরের মধ্যিখানে চৌরাস্তার মোড়ে উঁচু একটা মঞ্চে সেই বৃদ্ধকে তারা ঝুলিয়ে রেখেছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার শরীর পচে যায়নি। রোদেজলে কেবল গায়ের চামড়া হলদে আর কুঁচকে গেছে। ক্লান্ত পাখিরা কখনো কখনো ওর মাথায় এসে বসে। মুখটাকে নোংরা করে দেয়।

কালোকোলো লোকগুলো যখন ইমারত থেকে ওর উলঙ্গ শরীরটাকে তুলে নিয়ে এল তখনো তার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে যায় নি। কিন্তু লোকটা কেবল ধূসর চোখে চেয়ে থাকে, কথা বলতে পারে না।

ওরা ওকে দীর্ঘদিন মঞ্চের খুঁটির গায়ে ঝুলে থাকতে দেখেছে। অনেক দিন সে বেঁচেছিল।

দয়াল কেউ কেউ বলেছিল : ওকে ছেড়ে দাও।

অন্যেরা রাজি হয় নি। তাহলে ওকে চোখের আড়ালে রাখতে হবে। চোখের আড়ালে গেলে ওকে আমরা ভুলে যাব। ও যে একদিন ছিল এই স্মৃতিকে আমাদের জাগ্রত রাখতে হবে, শুধু আমাদের জন্যেই নয়, আমাদের পরে যারা আসবে, তাদের জন্যেও। কারণ চেতনা মূল্যবান সম্পদ, তাকে পবিত্র বহ্নির মতন সতর্ক হয়ে রক্ষা করতে হয়॥